দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ৯ জুলাই - ২০১২
২৪ আষাঢ় - ১৪১৯

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-রঙ্গ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত অনুজ ধরের বইতে :

নেতাজী অন্তর্ধানের ফাইল নষ্ট প্রণবের নির্দেশে □ ৯

সিঙ্গুর নিয়ে বিপাকে তৃণমূল-সিপিএম দু’পক্ষই □ ১০

খোলা চিঠি : সাবধান! রাজ্যে শিল্প আসছে;

সবাই মুখ বুজে থাকুন, টুঁ শব্দ নয় □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-রঙ্গ □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং সি পি এম □ রঞ্জিত রায় □ ১৪

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় □ অমলেশ মিশ্র □ ১৭

ঐতিহাসিক দুর্গ প্রতাপগড় □ সোমশুভ্র চক্রবর্তী □ ২২

গুরু গৈরিক পতাকা □ অভিজিৎ রায়চৌধুরী □ ২৩

চিরন্তনী মা □ বিদিশা ভট্টাচার্য □ ২৬

এই সৈয়দ সেই সৈয়দ নন □ শিবাজী গুপ্ত □ ২৭

বন্ধুত্বের জন্য ‘পূর্ব দিকে তাকাও’ নীতি □ জি পার্থসারথি □ ২৮

সবুজ অর্থনীতি ও ভারতবর্ষ □ বাসুদেব পাল □ ৩০

অসমে জয়জয়কার বিদ্যাভারতীর □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ বোধন : ২১ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অন্যরকম : ৩৩ □ বিশেষ প্রতিবেদন : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ সু-স্বাস্থ্য : ৩৮ □ রঙ্গম : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-রঙ্গ
পৃঃ ১২-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ২৪ আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৯ জুলাই - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : জলের ব্যবসায়ীকরণ

হতে পারে জলের আরেক নাম জীবন, কিন্তু টাকা না থাকলে সেই জীবনকে আর বাঁচানো যাবে না। কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রক সম্প্রতি 'জাতীয় জলনীতি - ২০১২' নামে জল সংক্রান্ত যে খসড়া প্রস্তাব এনেছে তাতে জলের বাণিজ্যিকিকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে এই বাণিজ্য যে অচিরেই লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখন জীবনরক্ষার প্রথম শর্তই হলো অর্থবল! কিন্তু কোথায় যাবেন ভারতবর্ষের ৮০ শতাংশ গরীব মানুষ? বাঁচার অধিকার কি তাহলে বড়লোকদেরই? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত প্রতিনিধিসভায় এর পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার প্রতিবেদন সহ এবারে আমাদের বিশেষ নিবন্ধে উঠে এসেছে এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই। লিখেছেন — বাসুদেব পাল, তারক সাহা।

দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

সফল কেরিয়ার গড়তে

স্থায়ী আয়ের এক সুবর্ণ সুযোগ!!!

মাধ্যমিক পাশ যে কোন ব্যক্তি/গৃহবধূ/বেকার ভাই-বোন/কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরা স্থায়ী আয়সহ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সত্বর যোগাযোগ করুন।

ভারত সরকারের ১নং অর্থনৈতিক সংস্থা L.I.C.-র অন্যতম Chief Adviser

মোমক ব্যানার্জী — মোবাইল—৯৮৩০৪১১৬৩৫

আপনি জানেন কি??

L.I.C. তার এজেন্টদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে তা সাধারণ কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরিজীবিদের থেকে অনেক বেশি।

L.I.C.-র এজেন্টদের সুযোগ-সুবিধার কিছু অংশ

- নির্দিষ্ট একটা আয়
- পেনশন
- টার্ম ইনসিওরেন্স (২ লক্ষ টাকা)
- গাড়ি/মোটর সাইকেল কেনার জন্য ঋণ (বিনা সুদের হারে)
- গ্রাচুইটি (২ লক্ষ টাকা)
- প্রতি বছর গ্যারান্টি বোনাস
- গৃহঋণ (নামমাত্র সুদের হারে)
- ছেলে-মেয়ের জন্মদিন বা বিবাহের জন্য অগ্রিম অর্থ।

"এজেন্সী প্রফেশন" জীবনের লক্ষ থাকে না, কিন্তু এই প্রফেশন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব জীবনে প্রতিষ্ঠার বড় বাধা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় লিখিয়াছিলেন— ...উচ্ছে বেগুন পটল মূলো...। হাটে গিয়া খরিদ করিতে হইবে। কিন্তু বিগত কয়েকদিন যাবৎ ওই সকল সবজির বাজারে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহাতে বিচলিত হইয়াছেন রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি কলকাতার কতিপয় বাজার পরিদর্শন করিয়া অগ্নিমূল্যের আঁচ বা তাপ কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছেন। গত ৩০ জুন একটি অনুষ্ঠানে স্বকণ্ঠে বলিয়াছেন— ''আমি ২/৩ দিন পরে মূল্যবৃদ্ধির কথা জানিতে পারিয়া বাজারে গিয়া পরিদর্শন করিয়া দ্রব্যমূল্য বিষয়ে অবগত হইয়াছি। আমাকে সময়মতো জানানো হয় নাই। ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছি। এই বৃদ্ধির জন্য কৃষক অথবা সাধারণ বিক্রেতারা দায়ী নহে। কতিপয় আড়তদার সরকারের বিরোধিতা করিয়া যোগসাজশে জনগণকে অসুবিধায় ফেলিতেছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর এই স্তোকবাক্যে জনগণের কষ্ট লাঘব হইতে পারে না।

বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, সরকার ও প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অসাধু ব্যবসায়ীগণ পূর্ব হইতে ফন্দী আঁটিয়া চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য সত্বেও কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিরাট পরিমাণে মুনাফা লুটিয়া থাকে। ইহাকে এককথায় প্রশাসনিক দুর্বলতা বলা যাইতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর একটি কথা সত্য—চাষী বা কৃষকেরা এক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়েন নাই। কেবলমাত্র আলুর উদাহরণই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। অভিজ্ঞতা অনুসারে ছোট ছোট কৃষকের ব্যাপক পরিমাণ আলু হিমঘরে রাখিয়া বাজারে মূল্য বৃদ্ধি হইলে তাহা হিমঘর হইতে বাহির করিয়া উচ্চ দামে বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। সেক্ষেত্রে তাহারা মাঠ হইতে ফসল (আলু) তুলিয়া মাঠেই ব্যবসায়ীদের নিকট ক্ষতি স্বীকার করিয়া অথবা মাথা বাঁচাইয়া মুনাফা ব্যতিরেকেই বিক্রয় করিয়াছেন। মুনাফাখোর আড়তদার ও কালোবাজারের কারবারিরা তাহা কিনিয়া হিমঘরে রাখিয়া এসময়ে ৪/৫ গুণ বেশি দামে বাজারে ছাড়িতেছেন। সেই সময়ে কৃষকেরা ৩০০ হইতে ৫০০ টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে (জুলাই) তাহা কিলোপ্রতি সর্বোচ্চ সতেরো টাকা দরে বিক্রীত হইতেছে। মেট্রো চ্যানেলের ওই সভায় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া বলিয়াছিলেন— ''ধান এত উৎপাদন হইয়াছে যে (সরকার) আমরা তাহা খরিদ করিতে পারি নাই। তথাপি চাউলের এত উচ্চ মূল্য! কেউ চক্রান্ত করিয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইতেছে।''

বলা বাহুল্য, সেদ্ধ-ভাত অথবা কচুপোড়া খাওয়া বা খাওয়ানোও এই বাজারে বিলাসিতার সমান। আমরা আম-আদমী—চাল-ডাল- তেল-লবণ-আলু কিঞ্চিৎ সস্তা বা সুলভ হইলেই খুশী। জিডিপি, বাজেট, ঘাটতি বাজেট প্রভৃতি শব্দ সাধারণ মানুষের কাছে বাগাড়ম্বর মাত্র। সাধারণ মানুষ নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য সুলভ এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল হইলেই খুশী। কচুপোড়া বা কাঁচালঙ্কা সহযোগে অন্ন গলাধঃকরণও আজ দুর্মূল্যের কারণে সরল নহে। হঠাৎ করিয়া ব্যাপক দামবৃদ্ধি হয় কিন্তু আয়বৃদ্ধি হয় না। জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি-দিগের ইহাতে কিছু ইতর-বিশেষ হয় না। শখ করিয়া একদিন গরীব শ্রমিকের বাড়িতে ভোজন করিয়া সংবাদের শিরোনামে আসা যায় কিন্তু সেই শ্রমিকের অবস্থার তাহাতে পরিবর্তন হয় না। ট্রেনে সর্বাধিক সুলভ ঝালমুড়িরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কোথাও আট, কোথাও বা আরও বেশি। অনেক সময় সাধারণ যাত্রীকে তাহার লোভ সংবরণ করিতে হয়।

জনপ্রতিনিধিদের জনতার প্রদত্ত অর্থে জনসেবার ঘোমটা মাথায় দিয়া জণগণের সুব্যবস্থা না করাটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। মূল্যবৃদ্ধির কুশীলবদের বিরুদ্ধে সত্বর কড়া ব্যবস্থা লওয়া একান্ত আবশ্যক।

যদি সাতদিনের মধ্যে কড়া ব্যবস্থার কারণে মূল্য হ্রাস না হয় তাহা হইলে বাজার পরিদর্শন বাজারী চমক বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

বলো, আমি যে কষ্ট ভোগ করছি, তা আমারই কৃতকর্মের ফল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। আমি যা সৃষ্টি করেছি, তা আমিই ধ্বংস করতে পারি। ... অতএব ওঠো, সাহসী হও, বীর্যবান হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করো— জেনে রাখো, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে শক্তি বা সাহায্য চাও, তা তোমার ভিতরেই রয়েছে।

— স্বামী বিবেকানন্দ।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে (বাঁ দিক থেকে) স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ, রাহুল সিনহা, চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, শংকর এবং তথাগত রায়। — ছবি : বাসুদেব পাল

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং চিন্তাবিদ অধ্যাপক তথাগত রায়ের ইংরেজীতে লিখিত পুস্তক 'দি লাইফ এন্ড টাইমস অফ্ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'-এর আবরণ উন্মোচন করে লোকার্পণ করলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর) এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা প্রেসক্লাবে গত ৩০ জুন বিকেল ৩টায় এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ।

অনুষ্ঠানের ভূমিকায় লেখক তথাগত রায় মঞ্চস্থ অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বইটির ভূমিকা (Forward) লেখার জন্য বিজেপি'র প্রবীণ সর্বভারতীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আদবানীজী ছাড়াও তিনি অধ্যাপক প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, লেখক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ এবং বিজেপি'র প্রাক্তন সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানান। প্রসঙ্গত, বই প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করেছেন দিল্লীর 'শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশন' এবং বইটি প্রকাশ করেছেন দিল্লীরই 'প্রভাত প্রকাশন'।

মঞ্চস্থ সকলেই স্বল্প বক্তব্য রাখেন। বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা তাঁর ভাষণে বলেন— অনেকদিন বাদে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রথম শহীদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী উপহার দেওয়ায় শ্রী রায় সকলের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদার্হ। এর আগে ডঃ মুখার্জীর জীবন বিষয়ে বিভিন্ন বই বের হলেও তাঁর জীবনের সার্বিক বিবরণ এই বইয়ে পাওয়া যাবে। তিন বছরের অক্লান্ত প্রয়াসে এই বই রচিত হয়েছে। বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় বলেন ডঃ মুখার্জীর রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরেও এক বড় মাপের মানুষ ছিলেন। সেই দিকটাও উল্লেখ করার মতো। লেখক শ্রীরায়ের সঙ্গে অনেকবারই তাঁর কথাবার্তা হয়েছে বলে শ্রী মুখোপাধ্যায় জানান।

বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকর্তা ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক 'শংকর' বলেন--- বাংলার অন্ততপক্ষে তিরিশজন মনীষীর বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়া উচিত। আমাদের এখানে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ বাদে বাকিরা ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন। অনেককে চেষ্টা করে জানতে দেওয়া হচ্ছে না। ডঃ মুখার্জীও এরই একটা শ্রেণীতে পড়েন। শ্রী রায় সেই সমস্যা দূর করেছেন। এজন্য তিনি প্রশংসার্হ। শেষে শ্রী রায় গ্রন্থ থেকে দুটি অধ্যায় পাঠ করে শোনান— (১) যখন শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দেন। (২) বাংলার হিন্দুদের প্রতি শ্যামাপ্রসাদের সাবধানবাণী।

আগামী ১৩ জুলাই দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে এই ইংরেজী বইটির সঙ্গে হিন্দী অনুবাদও প্রকাশ করা হবে। এদিনকার অনুষ্ঠানে অনেকেই লেখকের সাক্ষর সহ বইটি সংগ্রহ করেন। সাংবাদিক ছাড়াও অনেক শ্যামাপ্রসাদ অনুরাগী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত অনেকেই বাংলা অনুবাদ প্রকাশের জন্য শ্রীরায়কে অনুরোধ জানান।

কাশ্মীরে পুলিশ ও হিজবুল মুজাহিদিনের মধ্যে যোগাসাজশের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কাশ্মীর রাজ্য পুলিশের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক উগ্রপন্থী জেহাদি সংগঠন 'হিজবুল মুজাহিদিন' এর যোগসাজশের খবর পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা এ নিয়ে তদন্তে নেমেছে। ইতিমধ্যে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পুলিশের তিনজন পদস্থ অফিসারকে ইউ এ পি এ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। পুলিশেরই এক মুখপাত্র বিবৃতি দিয়ে একথা জানিয়েছেন।

জনৈক প্রাক্তন 'হিজবুল' ক্যান্ডারকে প্রাণে মারতে মরিয়া হয়ে আক্রমণের ঘটনার পরই ওই খবর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। ওই ক্যান্ডার জেল খাটার পর একটি হোশিয়ারি দ্রব্যের দোকান চালাচ্ছিল শ্রীনগরের শেরগাড়ি থানা এলাকায়।

উপরোক্ত তিনজন পুলিশ অফিসারকে পুলিশই গ্রেপ্তার করেছে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে। শ্রীনগরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনায় ধৃত পুলিশকর্তাদের যোগাযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরমধ্যে প্রাক্তন হিজবুল কম্যান্ডার গোলাম হাসান মীর ওরফে শাবনম্ এর উপর আক্রমণের ঘটনাও রয়েছে। দক্ষিণ কাশ্মীরের ত্রাল অঞ্চলের লোরগাম গ্রামে তার বাড়ি। শাবনম্ শ্রীনগরের সাদ্রাবল-এ তার হোসিয়ারীর দোকানে থাকাকালীন তার উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে গত ৭ জুন। শাবনম্ ২০০৬-এ গ্রেপ্তার হয়েছিল। একবছর আটক থাকার পর মুক্তি পায়। তার ব্যবহারে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিদের সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তাদের নজরে ছিল শাবনম্। জঙ্গিরা শাবনম্ এর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল। শ্রীনগরে শাবনম্ এর বাড়ি ও দোকান রয়েছে। গলায় বুলেটের ক্ষত নিয়ে সে এখন শ্রীনগরের হাসপাতালে শয্যাশায়ী। পুলিশই কয়েকজন পুলিশের কতিপয় সাধারণ নাগরিকের মাধ্যমে হিজবুল জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অনেকটা নিশ্চিত হয়েই পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সূত্রমতে ধৃত দুই পুলিশ অফিসারের নাম— মহম্মদ আব্বাস এবং ইলিয়াস আহমেদ। দক্ষিণ কাশ্মীরের তিনটি জেলায় তাদের চক্রান্তজাল প্রসারিত। সূত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা ষড়যন্ত্রের গভীরে অনুসন্ধান করতে চাইছে। খতিয়ে দেখছে— সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ, নিরাপত্তাবাহিনী এবং মূলস্রোতের রাজনৈতিক কর্মীদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে গোষ্ঠীটির যোগাযোগ কতটা।

মাও দমনে কেন্দ্র প্রদত্ত অর্থ খরচে ব্যর্থ রাজ্যগুলো

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্র সরকার 'নিরাপত্তাকারণ-জনিত খরচ তহবিল' ২০১১-১২-এর 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' না পেলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অর্থ বরাদ্দ করবে না বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, অতিবাম মাওবাদী ও নকশাল উপদ্রুত রাজ্যগুলির জন্য নিরাপত্তা খাতে অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করে আসছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সম্প্রতি এক চিঠিতে জানিয়েছে যে, ওড়িশা সহ নয়টি রাজ্য পুরো বরাদ্দ খরচ করে উঠতে পারেনি। ওই তালিকায় অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ছত্তিশগড়ের নামও রয়েছে। ছত্তিশগড়ই এসময়ে সর্বাপেক্ষা মাওবাদী সন্ত্রাসে জর্জরিত রাজ্য।

ওই তহবিলের (সিকিউরিটি রিলেটেড এক্সপেনডিচার) মাধ্যমে লাল সন্ত্রাস উপদ্রুত এলাকায় পুলিশী পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং সন্ত্রাস-অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাঠানো পত্রের শিরোনাম ছিল--- "অ্যানুয়াল ওয়ার্ক প্ল্যান ফর ২০১২-১৩ আন্ডার এস আর ই স্কীম।"

যে সকল রাজ্য ২০১০-১১-র বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করে উঠতে পারেনি তাদের মধ্যে ওড়িশা ৫৬.৬২ কোটির মধ্যে ৩৬.৫৯ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি। মহারাষ্ট্র ২০.৯৩ কোটির মধ্যে ৩.৯৩ কোটি, বিহার ৩২.৮০ কোটির মধ্যে ৬.৩৪ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে অতিরিক্ত বরাদ্দ তখনই করা হবে যখন ২০১১-১২ অর্থবৎসরের পরীক্ষিত হিসাব ওই খাতে উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাবসহ জমা পড়বে। বকেয়া ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রাজ্যগুলি জমা না করলে এস আর ই-স্কীমে চলতি অর্থবছরে কোনও অর্থ বরাদ্দ হবে না।

	বরাদ্দ অর্থ	অব্যয়িত/উদ্বৃত্ত (২০১১-১২)
ওড়িশা	৫৬.৬২ কোটি	৩৬.৫৯ কোটি
বিহার	৩২.৮০ কোটি	৬.৩৪ কোটি
মহারাষ্ট্র	২০.৯৩ কোটি	৩.৯৩ কোটি

এর ফলে দুটো প্রশ্ন উঠছে— (১) রাজ্য সরকারগুলো কি সত্যিই মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে সদিচ্ছার সঙ্গে তৎপর? (২) অনুন্নত উপজাতি জনজাতিদের উন্নয়ন কি তাঁরা সত্যই চান?

চিদাম্বরমদের আড়াল করতে চাইছে যৌথ সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় সমিতি (জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি) ২-জি কেলেঙ্কারীর সময়কার অর্থমন্ত্রী ও বর্তমান গৃহমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে সাক্ষী হিসেবে ডাকতে চায় না। এই মর্মে সংখ্যাধিক্যে ভারী জে পি সি-র চেয়ারম্যান কংগ্রেসী সাংসদ পি সি চাকোর বলে বলীয়ান হয়ে তারা চিদাম্বরমের সাক্ষ্য গ্রহণকে যেনতেন প্রকাররেন এড়িয়ে যেতে আজগুবি যুক্তি খাড়া করছে। চেয়ারম্যান চাকোরের মত অনুযায়ী জে পি সি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে রিপোর্টের খসড়া চূড়ান্ত করতে চায় যাতে রিপোর্টটি ডিসেম্বরেই লোকসভায় পেশ করা সম্ভব হয়।

চিদাম্বরম

এই যুক্তিতে তিনি জানিয়েছেন সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া আরও চালিয়ে গেলে রিপোর্ট যথাসময়ে পেশ করা যাবে না। তাঁর এই পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের ফলে চিদাম্বরম্ ও এ-রাজার মতো রুই-কাতলাদের জে পি সি-র মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা বানচাল হতে চলেছে।

এই মর্মে আরও প্রকাশ গরিষ্ঠাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারীতে জড়িত থাকার জোরালো অভিযোগ সত্ত্বেও তাদের কাউকেই জে পি সি-র মুখোমুখি না হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই প্রায় পাকা হয়ে গেছে। সংবাদসূত্র অনুযায়ী বিজেপি, এ আই এ ডি এম কে ও বাম সদস্যরা জে পি সি-তে সংখ্যালঘু হওয়ায় গোড়া থেকেই প্রধানমন্ত্রী, চিদাম্বরম্ ও অন্যান্য ভূতপূর্ব টেলি যোগাযোগ মন্ত্রীদের জে পি সি-র মুখোমুখি হওয়ার দাবী অসংখ্যবার জানালেও তাতে আদৌ আমল দেওয়া হয়নি। তথ্যাভিজ্ঞমহলের সূত্র অনুযায়ী জে পি সি-র মধ্যে থাকা দ্বিতীয় ইউ পি এ-র সদস্যরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এই ইউ পি এ সদস্যদের বিরোধিতাতেই মামলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জে পি সি-কে এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়ে পড়েছে।

চিদাম্বরম্ ও মনমোহন সিং-সহ অভিযুক্ত অন্যান্য মন্ত্রীদের জে পি সি-র মুখোমুখি হওয়া আটকানোর গুপ্ত অভিপ্রায়টি চেয়ারম্যান চাকো গত জুন মাসের সাংবাদিক সম্মেলনে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রায় প্রকাশ্যে এনে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি রিপোর্ট জমা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি এতটাই আন্তরিক যে পারলে রাম ছাড়াই রামায়ণ লিখে ফেলেন আর কি! তাঁর মত অনুযায়ী জে পি সি-র কাছে এত দলিল দস্তাবেজ ইতিমধ্যে এসে গেছে যে জন্যে আর কোনও মন্ত্রীকে ডাকার দরকার পড়বে না। যদিও সদস্য এম পি-রা অনেক সাক্ষীকেই ডাকার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতানুসারে সময়াভাবে তা করা যাচ্ছে না আর প্রয়োজনও নেই।

উল্লেখযোগ্যভাবে জে পি সি-কে সাহায্য করতে বিজেপি-র ভূতপূর্ব দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশবন্ত সিন্‌হা ও যশবন্ত সিং যাঁরা উভয়েই জে পি সি-র সদস্য হয়েও তাঁরা নিজেরাই সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এখানে বলা জরুরি, জে পি সি গঠনের সময় ১৯৯৭ থেকে ২০০৮-এর সময়সীমা পর্যন্তই তদন্তের পরিধি নির্ধারিত হয়। সেই মর্মে এ পর্যন্ত বহু ভূতপূর্ব টেলিকম সেক্রেটারী ও বর্তমান TRAI-এর জে আর এ প্রধান সহ সি এ জি-কে পাঁচবার জেরা করা হলেও বাকিরা অজ্ঞাত কারণে ডাক পাননি। সূত্র অনুযায়ী জে পি সি সদস্য শাসকদলের অনেক এম পি-ই এখন আবার বহু টেলিকম আধিকারিক ও সি বি আই-এর তদন্তকারী অফিসারদের তলব করার ইচ্ছে প্রকাশ করছেন। এর থেকে রিপোর্টটিকে দীর্ঘসূত্রতার ফাঁদে জড়ানো শুধু নয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের আড়াল করতে কালক্ষেপ করার অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ছে। শাসক দলে এই চক্রান্তের আভাস পেয়ে বিরোধী পক্ষের এক সদস্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন ২-জি কেলেঙ্কারীর উন্মোচন করতে যে জে পি সি গঠিত হয়েছিল ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীদের সাক্ষ্য না নিলে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

পি সি চাকো

এখানে উল্লেখ্য গত লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রায় সম্পূর্ণটাই জে পি সি গঠনের দাবীতে বিরোধীরা অচল করে রাখেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন পি এ সি-র কাছে জবানবন্দী দিতে রাজী হন।

কিন্তু বিরোধীদের তীব্র আন্দোলনের ফলেই শেষমেষ জে পি সি গঠন করতে সরকার একরকম বাধ্য হয়। কংগ্রেস যে কেলেঙ্কারীটিকে চিরাচরিত অভ্যাস মতো ধামাচাপা দিতে চায় তার প্রথম প্রমাণ গত বছর পি এ সি কার্যকর থাকাকালীনই নজরে আসে। পি এ সি চেয়ারম্যান মুরলীমনোহর যোশী বিতর্কিত কর্পোরেট সংযোগকারী নীরা রাডিয়া রতন টাটা ও অনিল আম্বানীদের কমিশনের মুখোমুখি হওয়ার ডাক পাঠালে এই জে পি সি চেয়ারম্যান পি সি চাকো তার তীব্র বিরোধিতা করে লোকসভায় সোরগোল ফেলে দেন। এখন তারাই শেষপর্ব চলছে বলেই দিল্লীর তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত অনুজ ধরের বইতে

নেতাজী অন্তর্ধানের ফাইল নষ্ট প্রণবের নির্দেশে

কথায় আছে লজ্জা, ঘেন্না, ভয় এই তিনটি থাকলে জীবনে উন্নতি হয় না। এই উন্নতি আধ্যাত্মিক নয়। সমাজে অর্থ প্রতিপত্তির উন্নতি। পশ্চিমবঙ্গের ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য নেতারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা দু' কান কাটা। তাঁদের লজ্জা, ঘেন্না ও জনসমর্থন হারানোর ভয় কোনওটাই নেই। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ভাঙিয়ে করে খাওয়া এই দলের বর্তমান নেতারা রাষ্ট্রপতিপদে কংগ্রেস প্রার্থী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে জেতাতে প্রাণপাত করছেন। এই প্রণববাবু ১৯৯৬ সালে দেশের বিদেশমন্ত্রী থাকাকালে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ দুই দশক ধরে গোপনে অনুসন্ধান চালিয়ে লেখক সাংবাদিক অনুজ ধর তা প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম, 'ইন্ডিয়াজ বিগেস্ট কভারআপ'। লেখক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, প্রণব মুখোপাধ্যায় নেতাজী রহস্যের সমস্ত তথ্য পেয়েছিলেন। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি-র সেই গোপন ফাইল হাতে পাওয়ার পর প্রণববাবু যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করেন। কেজিবি-র এই গোপন ফাইলটি পাঠিয়ে ছিলেন মস্কোতে সেই সময়ের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ফাইলটি পড়ে তাঁর সামনে চেয়ারে বসা তৎকালীন বিদেশ সচিব সলমান হায়দারকে বলেন, "হে ভগবান। এসব তথ্য নষ্ট করে ফেলুন। কোনওভাবেই যেন বাইরে না বেরোয়।"

এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য একটি ঘটনাও আছে। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হলে কেজিবি-র নিজস্ব আর্কাইভের দরজা রিসার্চ স্কলারদের জন্য কিছুটা উন্মুক্ত করা হয়। তখন নয়াদিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব নেতাজী সম্পর্কে কেজিবি-র সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে পাঠানোর অনুরোধ করেন রাষ্ট্রদূতকে। মস্কো থেকে সেই ফাইল এলে স্বাভাবিকভাবেই তা মতামত বা নির্দেশের জন্য বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে দেন তাঁর মন্ত্রকের সচিব সলমান হায়দার। এরপর প্রণববাবু দুটি নির্দেশ দেন সচিবকে। এক, এই ফাইলের বিষয়বস্তু বাইরে বেরোলে কড়া শাস্তি দেওয়া হবে যুগ্ম সচিবকে। দুই, মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে জরুরী নির্দেশ পাঠান নেতাজী সম্পর্কে কেজিবি-র সমস্ত তথ্য পাকাপাকিভাবে ধামাচাপা দিতে। ভবিষ্যতে বিশ্বের কোনও 'রিসার্চ স্কলার' আর্কাইভ থেকে এই বিষয়ে কোনও তথ্য হাতে না পান তা সুনিশ্চিত করার বন্দোবস্ত করতে বলেন প্রণববাবু। প্রণববাবুর নির্দেশে মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রাশিয়ার নয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, নেতাজী সম্পর্কে কেজিবি-র তথ্য অবিলম্বে গোপন করতে হবে। কারণ, তথ্যগুলি জানাজানি হলে রুশ-ভারত-মৈত্রী বন্ধন নষ্ট হবে। রুশ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে আর্কাইভের কর্তারা বেশ কয়েকটি 'টপ সিক্রেট' ফাইল সরিয়ে নেন। এর আগে, ১৯৯৪ সালে প্রণববাবুর নির্দেশে বিদেশমন্ত্রকের আমলারা নেতাজীর ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করেছিলেন।

গূঢ়পুরুষের

কলম

যুক্তি ছিল, জাপানের সামরিক বিভাগের দেওয়া 'ডেথ সার্টিফিকেট' গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অনেক অসঙ্গতি আছে। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপে বিদেশমন্ত্রক নেতাজীর 'ডেথ সার্টিফিকেট' বিলি করেনি!

বিদেশ মন্ত্রকের ডেথ সার্টিফিকেটে বলা হয়েছিল, ১৯৪৫ সালে তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়। প্রণববাবুও ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্র প্রচার করেছেন এবং এখনও বিশ্বাস করেন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছিল। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সমাধানে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রণববাবু এই কথাই বলেছিলেন। মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়ে ২০০৫ সালে। তখন প্রথম ইউপিএ জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল। প্রণববাবুর তৎপরতায় মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট স্রেফ গায়েব করে দেওয়া হয়। রিপোর্টের যে সামান্য অংশ জানা যায় তাতে কমিশন বলেছিল যে ১৯৪৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হননি। আজও মুখার্জী কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি কংগ্রেস জোট সরকার গোপন করে রেখেছে।

সাংবাদিক অনুজ ধর খোলাখুলিভাবে বলেছেন, ১৯৪৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মোটেই মারা যাননি। ১৯৪৫ সালের পর নেতাজী যে সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিলেন তার তথ্য প্রমাণ, আলোকচিত্র অনুজবাবু তাঁর বইতে দিয়েছেন। 'ইন্ডিয়াজ বিগেস্ট কভারআপ' বইটি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রকাশক বইটি বাজারে আনছেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর। বইটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এতে কেজিবি, সি আই এ এবং বৃটিশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের গোপন ফাইল অবিকল ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অংশ বিশেষ নয়। পুরো রিপোর্টই ছাপা হয়েছে। নেতাজীর মৃত্যু রহস্যভেদ করতে যে ব্যক্তি সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাধা দিয়েছে তাকেই আজ নেতাজীর নাম ভাঙিয়ে রাজনীতি করা দল ফরওয়ার্ড ব্লক রাষ্ট্রপতি পদে সমর্থন করছে। এর থেকে বড় ধাপ্পাবাজী রাজনীতি আর কী হতে পারে?

যাঁরা বাঙালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে প্রণববাবুকে সমর্থন করার কথা বলছেন, তাঁরা ভুলে গেছেন দেশের গণতন্ত্র হত্যাকারী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার অন্যতম কারিগর ছিলেন এই প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁরা ভুলে গেছেন, কালো টাকার কারবারি হাসান আলিকে রক্ষা করেছেন প্রণববাবু। হাসান আলি মামলা এখন ধামাচাপা দেওয়া আছে। সুইস্ ব্যাঙ্কে কালো টাকার ভারতীয় আমানতকারীদের তালিকা হাতে পেয়েও অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সেই তালিকা গোপন করেছেন। আজও গোপন আছে। সেই টাকা উদ্ধারে তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চেয়ে সংসদে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। প্রণববাবু জবাব এড়িয়ে গেছেন। প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিক রাম জেঠমালানি প্রণববাবুকে লেখা এক খোলা চিঠিতে দাবি করেছেন, সুইসব্যাঙ্কে কমপক্ষে ১৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতের কালো টাকার মালিকরা গোপনে রেখেছে। এই টাকা যদি উদ্ধারে প্রণববাবু উদ্যোগী হতেন তবে ভারতের মানুষের দারিদ্র বলে কিছু থাকতো না।

প্রণববাবু কালো টাকা উদ্ধার করার পথে না হেঁটে কালো টাকার মালিকদের পরিচয় গোপন রাখতেই বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন। এরপরেও আমাদের সকলকে বলতে হবে, প্রণববাবুই রাষ্ট্রপতিপদে একমাত্র যোগ্য প্রার্থী। আমাদের সমস্বরে বলতে হবে, বাঙালি হিসাবে আমরা গর্বিত। ভুলেও বলবেন না, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন দাস অথবা ঋষি অরবিন্দের বাংলার প্রতিনিধি প্রণব মুখোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি। তা হলে বাংলা মায়ের এই বরেণ্য সন্তানদের অপমান করা হবে। দয়া করে বাংলার মহান সুসন্তানদের অপমান করবেন না।

সিঙ্গুর নিয়ে বিপাকে তৃণমূল-সি পি এম দু'পক্ষই

নিশাকর সোম

প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের শিল্পের জন্য জমিদান নিয়ে দুর্নীতির কথা উঠেছে। উল্লেখ্য টাটাদের সঙ্গে 'গোপন' চুক্তির কথা বারবার তুলেছিল বামফ্রন্টের শরিকদলগুলি। সেই গোপন চুক্তির খবর নিয়ে নানান কথা হয়েছিল— যেমন হীরের হার নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিল। সিপিএম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কখনই এসব গুজব সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। কেন? শোনা যাচ্ছে এখন নাকি বুদ্ধ-নিরুপম সম্পর্কে নানা অভিযোগ কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে জমা পড়ছে। অভিযুক্তরা ইতিমধ্যে নিজেদের 'ডিফেন্স' গুছিয়ে নেবে।

এই সিঙ্গুর এপিসোডের সময়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসেছিলেন। এমনকী রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর 'হাড়হিম করা অত্যাচার' বলা সত্ত্বেও বুদ্ধবাবু সেই রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনার বসে একটি চুক্তি পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন। সে সম্পর্কে পার্টির নিচের তলার কর্মীদের ক্ষোভ এবং রাজ্য- সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় নিরুপম সেন নাকি বলেছিলেন— 'বুদ্ধবাবুকে কে অধিকার দিল এই চুক্তি করার?' এই চুক্তি কার্যকর করতে দেননি তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী।

এখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীরও করুণ অবস্থা হয়েছে। 'সাংবাদিক-সাংসদ'-এর পরামর্শে সমাজবাদী নেতা মুলায়ম সিং-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'আমাদের প্রার্থী' বলে তিনটি নাম ঘোষণার হাস্যকর পরিণতি ঘটলো। নেত্রী কি করে ভুলে গেলেন— যখন সিপিএম, ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, তখনই এই মুলায়ম সিং এগিয়ে এসে সমর্থন করে ইউ পি এ সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এর নেপথ্যে কাহিনী বড়ই মজার। মুলায়ম সিং সিপিএমের সাধারণ-সম্পাদক প্রকাশ কারাটকে নাকি কথা দিয়েছিলেন যে তিনিও বিরোধিতা করে ইউপিএ মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবেন ও তৃতীয় ফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গড়া হবে। এর পরেই মুলায়ম উল্টো চালে মাৎ করে দিলেন কারাট অ্যান্ড কোং-কে! মুলায়ম সিং-এর আগে একবার সিপিএমের তদানীন্তন সাধারণ-সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ-কেও সমর্থনের কথা বলে উল্টো করেছিলেন। সুরজিৎ মন্তব্য করেছিলেন— 'আমার মতো লোককে মুলায়ম ঘোল খাইয়ে দিলেন!' তৃণমূল নেত্রীকে সর্বভারতীয় নেত্রী করা এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্ণায়ক হওয়ার কথা শুনিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বস্তুত নেত্রীকে চরম সঙ্কটে নিক্ষেপ করে দিলেন সেই সাংসদ

রাজ্য রাজনীতি

সাংবাদিক। একসূত্রে জানা গেল— আজ তিনি তৃণমূলের কেন্দ্রীয় মুখপত্রের বিশ্লেষক কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকায় তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে কি চীনে গিয়েছিলেন তিনি? এখন তো নেত্রীর সসেমিরা অবস্থা। দীনেশ ত্রিবেদী, কবীর সুমন প্রকাশ্যেই প্রণব মুখার্জিকে সমর্থন ঘোষণা করেছেন। তৃণমূলের আরও কিছু সাংসদ নেত্রীকে 'শিক্ষা দেবা'র জন্য ক্রশ ভোটিং করতে পারেন। এঁদের মধ্যে সোমেন মিত্র অন্যতম।

নেত্রীর আর একটি সঙ্কট হলো— সিঙ্গুর। এই সিঙ্গুর এবং টাটারা মিলে বুদ্ধমন্ত্রিসভার বিদায়ের শেষ ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়েছিল এবং তখন বিরোধী নেত্রী প্রধান অনুঘটকের কাজ করেছিলেন। ইতিহাস বড়ই নির্মম— এই সিঙ্গুরই এখন নেত্রীর গলার কাঁটা। সিঙ্গুর বিল হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চের রায়ে অসাংবিধানিক বলে ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল বলেছেন তাঁকে রাজ্য সরকার এহেন পরামর্শ দিয়েছিল। অতীতের 'তরমুজ', বর্তমানে নেত্রীর দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট যিনি তৃণমূলের কাউন্সিলার আর কংগ্রেসের বিধায়ক থেকে দিব্যি রাজনীতিতে নেতা থাকলেন এহেন ব্যক্তি বলেছেন— 'রাজ্যপাল এমন কথা বলেননি'— এর অর্থ বলা উচিত হয়নি। রাজ্য সরকারের পক্ষে যিনি কৌশলী মামলা লড়েছিলেন, তিনি বলেছেন— 'যখন আমরা সিঙ্গেল বেঞ্চে জিতেছিলাম, তখন রাজ্যপাল কিছু বলেননি। এখন বিরোধীরা বলতে শুরু করামাত্রই রাজ্যপাল সরকারের বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন!' উল্লেখ্য এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের নেতা সর্দার আমজাদ আলি (যিনি আইনীজীবীও) একবার জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াই করেছিলেন তিনি বলেছেন— 'রাজ্য সরকার পরাজিত হবে এটা জানা ছিল— কারণ রাজ্য-সরকার নিম্নমানের উকিলের তালিকা তৈরি করেছে।' বলাই বাহুল্য এ ইঙ্গিত নেত্রীর বিশ্বাসভাজন সাংসদ (উকিল) কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি করা হয়েছে। আমজাদ আলি প্রণববাবুর সঙ্গে একসঙ্গে বাংলা-কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস-এ যোগাদান করেছিলেন। এখন রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য-সরকার লড়াইয়ের পথে। স্মরণীয় শিক্ষাক্ষেত্রে যখন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল তখনও এই রাজ্যপাল সমালোচনা করেছিলেন। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর উষ্মা দেখা গিয়েছিল। তাইতো রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শাহরুখ খানের সঙ্গে সমস্তরকম প্রোটোকল জলাঞ্জলি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। এখন রাজ্যপাল অনড়ভাবে বলে চলেছেন— 'আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাগবে না। নাকি মুখ্যমন্ত্রীর কথায় তিনি চলেছিলেন? সে যাইহোক সিঙ্গুর-এর জমি ফেরত অনিশ্চিত। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন— সেখানে তো টাটারা, চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য বাঘা বাঘা আইনজীবীদের নিযুক্ত করবেন। এটা ভেবেই হঠাৎ করে মহাকরণে বসে মুখমন্ত্রী সিঙ্গুরের জমিহারাদের ভাতা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। বিধানসভা চলাকালীন বিধানসভাকে এড়িয়ে একাজ কি সাংবিধানিক? সিঙ্গুরের রায়ের ফলে রাজ্যে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সংশয় থাকল। ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই আইন করতে হবে। তৃণমূলের মধ্যে দাবি উঠেছে— আদালতের বাইরে টাটাদের সঙ্গে সমঝোতা করার ব্যবস্থা হোক।

সাবধান! রাজ্যে শিল্প আসছে
সবাই মুখ বুজে থাকুন, টুঁ শব্দ নয়

মাননীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্পমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয় মন্ত্রীমশাই,

আপনার মতো হেভিওয়েট মন্ত্রীকে কি বলে যে সম্বোধন করি ভেবে ভেবে বেশ ক'মিনিট কাটিয়ে তবে লেখা শুরু করলাম। শেষে ওই 'মশাইটাই' ঠিকঠাক মনে হচ্ছে। এ চিঠি কি আপনার সময় হবে পড়ার? আপনি কত ব্যস্ত মানুষ! প্রতিদিন কত কত শিল্পের আবেদন পত্র পড়তে হয়। কত বিনিয়োগের হিসেব রাখতে হয়। কে কোথায় কতটা জমি পাবে, কত দিনের মধ্যে কাজ করবে! মউ, মোয়া হবে। তারপর ঘটা করে শিলান্যাস হবে। রিমোট টিপে পর্দা সরবে ফলকের। সেসবের জন্য 'ডেট' দিতে হয়। দেশ বিদেশের কত বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ব্যস্ততা কি কম?

তারমধ্যেও আবার বিরোধীদের চেল্লামেল্লি। হাজার প্রশ্ন, কে কে আসছে, কোথায় আসছে, কী নিয়ে আসছে, কী হবে, কী হবে না— বাপরে বাপ! কৌতূহলের সীমা নেই। আমিও আপনার সঙ্গে একমত, এত কথা বললে শিল্পলক্ষ্মীর আরাধনা করা যায় না। শিল্প একটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার। সেনসেটিভ ব্যাপার। কম্পিটিটিভ ব্যাপার। গুজরাতের ওই মোদি তো হাঁ করে আছে। বিনিয়োগ দেখলেই গাপ করে গিলে নেয়। সবাই এসইজেড চায়। রিটার্নের হিসেব করে। সবাই ভাবে এদের শিল্পনীতিটাই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বড্ড গোলমেলে। টাটা দাদারা চলে গেল কেন? এখনও মামলা চলছে কেন? আমাদেরও অমন হবে না তো? এসব নানা প্রশ্নের সামনে যে আপনাকে পড়তে হচ্ছে তা তো আমি জানি। দিদি তো বলেই খালাস। ঝক্কি তো সবই আপনার। মাঝে মাঝে আপনার মতো আমারও মনে হয় জানেন, ওই বিরোধী দলনেতা তকমাটাই ভাল ছিল। দিদি চেঁচালে চেঁচানো যেত। কিন্তু এ কাঁটার মুকুট যে চাইলেও এখন খোলা যাবে না।

কিন্তু মন্ত্রীমশাই এটা তো ঠিক আপনি এমনটাই চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, ক'দিনেই দেখিয়ে দেবেন বুদ্ধবাবুকে শিল্পায়ন কাকে বলে। ধরবেন আর আনবেন। ধরবেন আর আনবেন। আপনার দিদিও তেমনি ভেবেছিলেন। দিদির মা-মাটি-মানুষও তেমনি ভেবেছিল।

আসলে বাড়িতে অনেকদিন পর কোনও শিশু জন্মালে যেমন হয় আর কি। বাঙালির চির অভ্যাসের আদিখ্যেতা আর দেখে কে? ও মা! কি মিষ্টি মুখটা। ইস্ হাসিটা দেখ। একেবারে বাবারটা বসানো। দেখ দেখ কানের লতিটা একেবারে ঠাম্মার মতো। কী-ই ফুটফুটে গো!

দেখিস এই মেয়ে বড় হয়ে লেখাপড়ায় দারুণ হবে। যেমন ভাল রাঁধবে তেমন সুন্দর বিনুনিও বাঁধবে। এ মেয়ের কৃষিও হবে, শিল্পও হবে। এত এত বিনিয়োগ আনবে। সংসারকে একেবারে সুখে ভরিয়ে দেবে।

কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই সবাই বলা শুরু করে দিয়েছে, দেখ দেখ গায়ের রংটা ঠিক মামাবাড়ির মতো পেয়েছে। দিন দিন কালো হচ্ছে। বিয়ে দেওয়া যাবে তো! মুখে যেন খই ফুটছে। উল্টো দিকে এটা ভাঙছে, ওটা ছুঁড়ছে। কী দস্যি মেয়ে দেখো।

একে দিয়ে শুধু কথাশিল্প হবে। কাঁথা শিল্পও হবে না।

কি এক মত হলেন তো পার্থবাবু? নানা, এটা সত্যি বলছি না। বলছি রাজ্যের মানুষ এটাই ভাবছে তো নাকি! যাই হোক, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সত্যি করে বলুন তো আপনি নিজেও কি জানেন, এরাজ্যে ঠিক কতটা বিনিয়োগ আসছে? 'জমি ব্যাঙ্ক' কি তৈরি হয়েছে? তা থেকে আদৌ বড় শিল্পের জন্য এক লপ্তে বেশি জমি পাওয়া যাবে কি?

আপনার বিধানসভায় দেওয়া উত্তরটা আমার জানা। মমতা সরকারের ১৩ মাসে ১৭৬টা শিল্পের প্রস্তাব এসেছে। বিনিয়োগ হতে পারে ১ লক্ষ কোটি টাকার মতো। ৫৯টি প্রকল্পের লিজ চুক্তি হয়েছে। ৬৭টির আলোচনা চলছে। ৫০টি প্রকল্পের মালিকদের পাওয়াই যাচ্ছে না। রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার জমির হিসেবে করতে একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও এখনও চূড়ান্ত রিপোর্ট মেলেনি।

এসবে হবে, হতে পারে, আসতে পারে অনেক শুনেছি। আরও শুনতে চাই। সরকারের উদ্যোগ আর আহ্বানও শুনছি। শুনেই চলেছি। আরও শুনতে চাই। এবং মুখ বুজে অপেক্ষা করতে চাই। কারণ, আমি জানি শিল্প মামাবাড়ির মোয়া নয়। যে হাত বাড়ালেই মামী দিয়ে দেবেন। এর জন্য সাধনা করতে হয়।

জনগণ ও বিরোধীদের চুপ করানোর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। পার্থবাবু আপনি আপাতত ছবি তুলে যান। শিল্প হোক না হোক বাঙালিকে শিল্পের স্বপ্ন দেখানো বন্ধ করবেন না। কাজ না থাক কাজের স্বপ্ন ছাড়া বাঙালি বাঁচবে কী করে?

—সুন্দর মৌলিক

ফঃ ২

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-রঙ্গ

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ডঃ আব্দুল কালাম সরে যাওয়ার ফলে এখন দু'জন প্রধান প্রতিপক্ষ রয়েছেন— প্রণব মুখার্জী এবং পি এ সাংমা।

ডঃ কালামের নাম প্রথমে প্রস্তাব করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজবাদী দলের মুলায়ম সিং যাদব। কিন্তু হঠাৎ মুলায়ম সিং বিরাট এক ডিগবাজী খেয়ে ইউ পি এ-র প্রণববাবুর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তখন থেকেই শুরু হয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের স্বার্থ ও দর-কষাকষির খেলা। ভাঙন দেখা দিয়েছে সব শিবিরেই। বি জে ডি-র নবীন পট্টনায়ক এবং এ আই এ ডি এম কে-র জয়ললিতা চেয়েছেন পি এ সাংমাকে। এন ডি এ-র মধ্যে দেখা দিয়েছে দিশাহারা অবস্থা।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটটা হয় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। এবারের নির্বাচনে জটিলতা দর-কষাকষি ব্যক্তিস্বার্থ এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে বলা যায় না দলগতভাবে ভোটগুলো পড়বে কিনা। প্রত্যেক জোট— এমন কি, অনেক দলের মধ্যেও মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— সেই জন্যই বলা শক্ত সবাই দলের সিদ্ধান্ত মানবেন কি না।

এই অবস্থায় ডঃ কালাম সরে গিয়েছেন। তার ফলে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে প্রণব মুখার্জী ও সাংমার মধ্যে।

এই নির্বাচনের ফলাফল কি হচ্ছে সেটা দিয়ে অনেক আগে থেকেই পর্যবেক্ষকরা হিসেব-নিকেশ শুরু করে দিয়েছেন। অবশ্যই প্রধান দুই শিবির— ইউ পি এ এবং এন ডি এ-র ভোটের একটা হিসেব করা যায়। কিন্তু দুটো জোটের কোনওটাই এখন অবিভক্ত নয়— এমন কি পশ্চিবঙ্গের বামফ্রন্টেও দেখা দিয়েছে ভাঙন। ইউ পি এ-র তৃণমূল যেমন ডঃ কালামকে সমর্থন করেছিল এবং তার সরে দাঁড়ানোর পর সাংমার ব্যাপারে নীরব থেকেছে, তেমনি এন ডি এ-র শরিকদলের সাংমা দাঁড়িয়েছেন তাঁর দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই। তার ফলে সব হিসেব এখন জটিল হয়ে গিয়েছে। সাংমার দল এন. সি. পি. তাঁকে বহিষ্কৃত করেছে, তবু তিনি প্রার্থী হয়েছেন এই নির্বাচনে।

এটা লক্ষণীয় যে, ইউ পি এ-র বৃহত্তম শরিকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রণব মুখার্জীর বিরোধিতা করেছে— এই দল সাংমাকে সমর্থন করবে কি না সেটা এখনও অজনা। তবে ইউ পি এ প্রার্থী প্রণব মুখার্জীকে সমর্থন জানিয়েছে সমাজবাদী দল, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, বহুজন সমাজ পার্টি, এন সি পি, ডি এম কে, সি পি আই (এম), ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দল। এন ডি এ-র শিবসেনাও আছে এই দিকে।

আর সাংমার দিকে আছে বি জে পি, এ আই এ ডি এম কে, বি জে ডি ইত্যাদি দল।

এই হিসেবে অবশ্যই ইউ পি এ-র প্রার্থী প্রণব মুখার্জী এগিয়ে আছেন। সাংমা তাই বিবেক ভোটের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর ধারণা— ভোট সেভাবে হলে তাঁর জয় অনিবার্য ব্যাপার হবে। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাল্লাটা ভারী প্রণববাবুর দিকেই। এভাবে দেখলে মনে হতেই পারে যে তিনিই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটটা হয় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। এবারের নির্বাচনে জটিলতা দর-কষাকষি ব্যক্তিস্বার্থ এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে বলা যায় না দলগতভাবে

ভোটগুলো পড়বে কিনা। প্রত্যেক জোট— এমন কি, অনেক দলের মধ্যেও মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— সেই জন্যই বলা শক্ত সবাই দলের সিদ্ধান্ত মানবেন কি না। কংগ্রেসের অনেক প্রবীণ নেতাই মনে হয় প্রণব মুখার্জীকে পছন্দ করেন না, তাঁরা কি তাঁকে ভোট দেবেন? সি পি আই (এম) দলের ভেতরে তাঁকে ভোট দেওয়া নিয়ে বেশ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, এন সি পি-তেও দেখা দিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রণব মুখার্জী সমর্থন পাবেন না আর এস পি এবং সি পি আই দলেরও।

সাংমার নাম প্রস্তাব করেছিল বি জে ডি এবং এ আই এ ডি এম কে দল। পরে বি জে পি প্রভৃতি দল তাঁকে সমর্থন করেছে। তাঁর দলের একটা বড় অংশও আছে তাঁর দিকে। আরও বড় কথা হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু সাংসদ ও বিধায়কও আছেন তাঁর পেছনে, সেক্ষেত্রে দলীয় ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া সাংমা দাবি করেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাঁরই দিকে। সেক্ষেত্রেও দলমতের কোনও দাম নেই। সুতরাং বলা চলে ভোটাভুটিটা এভাবে হলে পূর্ব-ধারণার সঙ্গে তার অমিল ঘটতে পারে অনেকটাই। গোপন ব্যালটে ভোট হওয়ার ফলে কিন্তু অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সাংসদ ও বিধায়কের যদি একটা করে ভোটের হিসেবে ফলাফল চূড়ান্ত হোত, তাহলে অন্য কথা ছিল। এক্ষেত্রে রয়েছে ভোটমূল্যের ব্যাপার— প্রত্যেকে একটা করেই ভোট দেন ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে ভোটমূল্যের ব্যাপারটা রয়েছে। সাংসদদের ভোটমূল্য এক হলেও বিধায়কদের ক্ষেত্রে তা নয়। রাজ্যের জনসংখ্যাকে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হয়, সেটাই হলো সেই রাজ্যের বিধায়কদের ভোটমূল্য। এটা বিভিন্ন রকম— সেইজন্যই জনবহুল উত্তরপ্রদেশের ৪০৩ বিধায়কের ভোটমূল্য ৬০ সদস্যের সিকিমের বিধায়কদের ভোটমূল্যের সমান নয়। এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রচুর ক্রসভোট হবে— এটা ধরে নিলে হিসেবটা বেশ গোলমেলে হয়ে যায়।

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটমূল্য ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৮৮২। জয়ী হতে হলে একজন প্রার্থীকে এর বিরাট অংশের প্রথম পছন্দের ভোট পেতে হবে। ইউ পি এ, এন ডি এ, বামফ্রন্ট ইত্যাদি গোষ্ঠী অটুট থাকলে কিন্তু হিসেবটা সহজ হোত। অবিভক্ত ইউ পি এ-র মোট ভোটমূল্য ৪,৬০,১৯১ আর এন ডি এ-র ৩,০৪,৭৮৫— যথাক্রমে মোট ভোটের ৪২ ও ২৮ শতাংশ। এই হিসেবেও প্রণব মুখার্জী এগিয়ে আছেন। কিন্তু ভোটের কতটা কে পাবেন, সেটা বলা কঠিন, কারণ সব শিবির ভেঙে গেছে।

সব শেষে অনেক 'কোটা'-র ব্যাপারটা। মোট প্রথম পছন্দের ভোটকে ২ (দুই) দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করলেই 'কোটা' পাওয়া যায়। ভোটাররা ব্যালট পেপারে তাঁদের প্রথম পছন্দের প্রার্থীর নাম জানান— তা না হলে ব্যালট-পেপার বাতিল হয়ে যায়। তাঁরা সেই সঙ্গে একাধিক প্রার্থী থাকলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পছন্দের কথাও জানাতে পারেন।

আগেই বলেছি— সব প্রথম পছন্দের ভোটকে একত্রিত করে তার অর্ধেকের সঙ্গে ১ যোগ করলেই 'কোটা' পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতিকে এই 'কোটা' পেতে হয়। প্রণববাবুর পক্ষে এই 'কোটা' পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আপাতত মনে হবে।

কিন্তু কোনও প্রার্থী 'কোটা' না পেলে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন সব চেয়ে কম ভোট-প্রাপ্ত প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং তাঁর ব্যালট থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থীর দ্বিতীয় পছন্দের ভোট তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তাতেও 'কোটা' না হলে এবার সর্বনিম্ন প্রার্থীর ব্যালট থেকে একই ভাবে ভোট বন্টন করা হয়। যতক্ষণ 'কোটা' না হয় বা একজন মাত্র প্রার্থী থাকেন, ততক্ষণ এটা চলে। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক হিসেবটা বদলেও যেতে পারে— দ্বিতীয় ব্যক্তিই নির্বাচিত হয়ে গেলে আশ্চর্যের কিছু থাকে না।

একটা কাল্পনিক উদাহরণ দিই। ধরা যাক 'ক', 'খ' ও 'গ' প্রার্থী আর ভোটারদের প্রথম পছন্দের ভোটমূল্য ১০,০০০। তাহলে 'কোটা' হবে ৫০০২। প্রথম পছন্দের ভোট পড়েছে এভাবে—

প্রার্থী	ভোট
ক	৪৫০০
খ	৩০০০
গ	২৫০০

এক্ষেত্রে কেউ 'কোটা' পাননি। সুতরাং গ-কে বাদ দিয়ে তাঁর ব্যালটের ক ও খ-র দ্বিতীয় পছন্দের ভোট ভাগ করে দিতে হবে তাঁদের মধ্যে। ধরা যাক ক ও খ দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পেয়েছেন ৩০০ ও ২০০২। তাহলে ক ও খ-র ভোট হবে যথাক্রমে ৪৮০০ ও ৫০০২। এক্ষেত্রে প্রথম পছন্দের ক রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না।

উল্লেখ করা যেতে পারে— ১৯৬৯ সালেই এই ব্যবস্থার দরকার হয়েছিল। ভি ভি গিরি, সঞ্জীব রেড্ডি এবং সি ভি দেশমুখ যথাক্রমে ৪,০১,৫৯৫টা, ৩,১৩,৫৪৫টা এবং ৯,১২,৭৬৯টা প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছিলেন— কিন্তু 'কোটা' হয়নি। এই কারণে পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে এবং দ্বিতীয় পছন্দের ভোট যোগ হওয়ায় শ্রী গিরি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু যদি প্রথম পছন্দের ভোটের ব্যবধান কম হয় এবং দ্বিতীয়জন অনেক বেশি দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পেয়ে যান, তাহলে ফলাফল অন্য রকম হয়ে যাবে।

এই সব কারণে বলা যায়— এমন গোপন ব্যালটের নির্বাচন-ফল নিয়ে আগাম কিছু বলা মুস্কিল। বিভিন্ন স্বার্থ, দলীয় মতভেদ, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং রাজনীতির জটিলতা রয়েছে এর মধ্যে। আমাদের উচিত ভোট-গণনা পর্যন্ত ধৈর্য ধরা।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৭.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ৩২৫.০০ টাকা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং সি পি এম

রঞ্জিত রায়

ভেঙে পড়ছে দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফাঁসে আমজনতা মৃত্যুপথযাত্রী। টাকার দাম প্রতিদিনই পড়তে পড়তে এখন তলানিতে। দেশজুড়ে মন্দার ধাক্কায় মানুষ দিশাহারা। ভারতের বর্তমান ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের জন্য দায়ী সদ্য পদত্যাগী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তথা কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ জোট সরকারের ভ্রান্ত উদার অর্থনীতি। দেশকে চরম বিপদে ঠেলে দিয়ে প্রণববাবু এখন রাষ্ট্রপতি পদের দৌড়ে নেমেছেন। একে আত্মসর্বস্ব স্বার্থপরতা ছাড়া অন্য আর কী বলা যাবে! প্রণববাবু দেশের অর্থনীতির হাল ধরার পর থেকেই চরম অর্থসঙ্কটে দিন কাটছে সাধারণ মানুষের। ধাক্কা খেয়েছে দেশের বাণিজ্য। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের লগ্নি গুটিয়ে নিয়েছে। দেশের এমন ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব ছেড়ে রাইসিনা হিলের রাষ্ট্রপতি ভবনের নিরাপদ বিলাসবহুল আরামে দিন কাটাতে চলে যাচ্ছেন। ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে ধাড়ি ইঁদুরের দল যেভাবে পালায় আর কী! আর এমনই এক কংগ্রেস নেতাকে কাঁধে তুলে 'নৃত্য' করছে তথাকথিত 'সর্বহারাদের স্বার্থরক্ষাকারী' মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। পশ্চিমবঙ্গে যে দলটাকে আমরা সিপিএম বলেই চিনি। যে দল এই রাজ্যে ৩৫ বছর ধরে নিজের আখের গুছিয়েছে। গরীব মানুষের স্বার্থরক্ষা করে নয়। গরীব মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে কমরেডরা খেয়েছে। তারাই এখন 'বাঙালি রাষ্ট্রপতি' চাই বলে বাংলার মানুষের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে বাজার গরম করছে। অথচ এই সেদিন কোঝিকোড়েতে পার্টির সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে সিপিএম নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা কংগ্রেস জোট এবং বিজেপি জোট থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখবে। সেই সিদ্ধান্তকে খারিজ করে রাতারাতি পার্টির পলিটব্যুরো ঘোষণা করে দিল, দল কংগ্রেস প্রার্থীকেই সমর্থন করছে। কিন্তু কেন সমর্থন করছে, প্রশ্ন সেটাই। যে প্রশ্নের জবাব প্রকাশ কারাত-বিমান বসুরা দলের নিচুতলার কর্মীদের দিচ্ছেন না। কোনওদিন দেবেনও না। কারণ, দেশের আর পাঁচটা সুবিধাবাদী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের মতোই সিপিএম এখন ক্ষমতালোভী আদর্শহীন দল।

প্রণব মুখার্জী

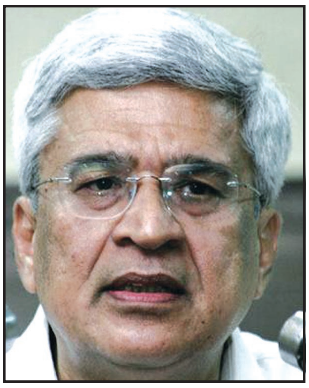

প্রকাশ কারাত

বিমান বসু

সিপিএম বরাবরই মনে করে দেশের চেয়ে দলের স্বার্থ বড়। দলের চেয়ে দলের নেতাদের ব্যক্তিস্বার্থ বড়। দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম নেতারা রাজনীতি করেছেন, গলাবাজি করেছেন কংগ্রেসের বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ নীতির বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষকে সিপিএম নেতৃত্ব এতকাল বুঝিয়েছেন রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা। আর এইসব অভিযোগের আঙুল যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিপিএম নেতারা তুলতেন সেই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হয়ে বিমানবাবুরা আজ সাফাই গাইছেন, 'প্রণববাবুই রাষ্ট্রপতি পদে একমাত্র যোগ্য প্রার্থী।' চমৎকার! বিগত ৩৫ বছর ধরে কংগ্রেস বিরোধিতার চূড়ান্ত পরিণতি এটাই। নিজেদের দলকে শৃঙ্খলাপরায়ণ কম্যুনিস্ট দল বলতে এই সেদিন পর্যন্ত যাদের বুকের ছাতি ফুলে উঠতো, সেখানে দলের নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গে জন-সমর্থন হারানোর 'জুজু' দেখিয়ে কেরল লবির কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে এনে বঙ্গজ লবির প্রবক্তরা কোন মার্কসবাদ শুদ্ধ করলেন বোঝা গেল না। তবে যে কথাটা বোঝা গেল তা হলো, এতকাল পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য-কংগ্রেসকে সিপিএমের 'বি-টিম' বলা হোত। এখন জাতীয় স্তরে সিপিএম কংগ্রেসের লেজুড় 'বি-টিম' বলে পরিচিত হয়েছে। কম্যুনিস্টদের মুখোশের আড়াল সরে মুখটি দেশের মানুষ দেখতে পেল। এরপর সিপিএমের নেতা, কর্মী, সমর্থকরা মাঠে ময়দানে চোঙা ফুঁকে সাধারণ মানুষকে কী বোঝাবেন সেটাই দেখার। সেটাই শোনার।

চলুন ফিরে দেখি সেই ২১ জুন বৃহস্পতিবার সকালবেলাটাকে, যেদিন দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল সিপিএম পলিটব্যুরো। যেদিন প্রণববাবুর সমর্থনে আলিমুদ্দিনের দীর্ঘ সওয়ালের সামনে নতিস্বীকার করেন পার্টির সুপ্রিমো প্রকাশ এলাপ্পল্লি কারাত। বৈঠকে বিমান বসু, নিরুপম সেনদের যুক্তি ছিল প্রণববাবুকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বাঙালি আবেগ ঘনীভূত হচ্ছে তাতে বিরোধিতার পথে গেলে রাজ্যে দলকে বিপাকে পড়তে হবে। ১৯৯৬ সালে জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার বিরোধিতা করে পার্টি যে 'ঐতিহাসিক ভুল' করেছিল তার পুনরাবৃত্তি চান না আলিমুদ্দিনের ম্যানেজাররা। সোজা কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা হারানো কম্যুনিস্টরা এখন চাইছেন জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে সোনিয়া গান্ধীর শাড়ির আঁচল

ধরে ক্ষমতার ছড়ি ঘোরাতে। একদা ঊনবিংশ শতকের কলকাতায় 'বাবুদের' এক গুচ্ছ লেজুড় মোসাহেব থাকতো। তারা বাবুর জুড়িগাড়ির পিছনে ছুটতো প্রসাদের লোভে। একবিংশ শতকে সিপিএম পার্টি কংগ্রেস বাবুর ভৃত্য, মোসাহেবগিরি করছে। সবিনয়ে বলতে হচ্ছে তথাকথিত মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির এমন অধঃপতন দেখব এমন কথা কোনওদিন ভাবিনি।

পলিটব্যুরোর বৈঠকে কেরল লবির বিরোধিতায় বিমান-নিরুপম- সূর্যকান্তরা পাশে পেয়েছিলেন ত্রিপুরার মানিক সরকার, অন্ধ্রের বি ভি রাঘুবালু এবং তামিলনাড়ুর কে বরদারাজনকে। উল্টোদিকে এস রামচন্দ্রন পিল্লাই, পিনারাই বিজয়ন, এ কে পদ্মনাভন, এম এ বেবি, কোডিয়েরি বালাকৃষ্ণণ। বেঙ্গল লবির প্রবক্তাদের বক্তব্য ছিল, প্রণববাবুকে ঘিরে বাঙালির আবেগ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। বাঙালির এই আবেগকে খারিজ করে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় রাজনীতিতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। জোটসঙ্গী কংগ্রেসের সঙ্গে তিক্ততা চরমে উঠেছে। এর ফায়দা নিয়ে লোকসভার নির্বাচনে হারানো আসনগুলিতে জেতা যাবে। এখন রাষ্ট্রপতি পদের দৌড়ে প্রণববাবুকে সমর্থন করলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে বাম বিরোধী ভোটের বিভাজন সহজ হবে। পলিটব্যুরোর বৈঠকে কেরল লবির বক্তব্য ছিল, বিগত কোঝিকোড়ের সম্মেলনে গৃহীত নীতি অনুসারে আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে সিপিএম কংগ্রেসের বিরোধিতা করবে। সেই নীতির কী হবে? দলের কর্মী সমর্থকদের কী জবাব দেবেন তাঁরা। নীতি ও আদর্শগত অবস্থানে দলের বড় রকম বিচ্যুতি ঘটেছে, এমন অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠবেই। কেরল লবির প্রবক্তাদের যুক্তি অকাট্য হলেও যেহেতু পশ্চিমবঙ্গই সিপিএমের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু তাই বঙ্গজ কম্যুনিস্টদের চটাতে সাহস করেনি পলিটব্যুরো। সরল ভাষায় ধান্ধাবাজির রাজনীতিকেই আঁকড়ে ধরেছে সিপিএম নেতৃত্ব। কিন্তু সিপিআই এবং ছোট বামদল আর এস পি তাদের আদর্শগত অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়নি। দুটি দলই বলেছে, 'আমাদের পক্ষে এন ডি এ বা ইউ পি এ-র প্রার্থীকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটাভুটিতে আমরা যোগ দেব না।' সিপিএম দলের এক নম্বর নেতা প্রকাশ কারাত দলীয় সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেছেন, 'কংগ্রেসের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু প্রণববাবুই রাষ্ট্রপতি পদে একমাত্র যোগ্যতম প্রার্থী।' কারাত সাহেবের এই ছেঁদো যুক্তি মানা যায় না। প্রণববাবুই যোগ্যতম প্রার্থী হলেন কীভাবে তা ব্যাখ্যা করে বলেননি প্রকাশ কারাত বা পলিটব্যুরো। এইতো সেদিন কলকাতায় পার্টির এক সভায় বাম জমানায় সিপিএমের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র তীব্র ভাষায় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁকে সমর্থনের বিরোধিতা করলেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি প্রণববাবুর ভূমিকাই নয়, তাঁর নেতৃত্বে যে আর্থিক নীতি নিয়ে ইউপিএ জোট সরকার চলছে তাকে তুলোধনা করেছেন মিত্র মশাই। স্বাভাবিকভাবেই তাই সিপিএমের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়েছে প্রণববাবুকে সমর্থনের সিদ্ধান্তে। মনে রাখতে হবে মহল্লায় মহল্লায় চোঙা ফুঁকে গলাবাজি করতে এই নিচুতলার কর্মীদেরই প্রয়োজন বিমান-বুদ্ধ-সূর্যকান্তদের। ভুললে চলবে না যে এরা বসে গেলে পার্টিই ধ্বসে যাবে।

> পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা হারানো কম্যুনিস্টরা এখন চাইছেন জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে সোনিয়া গান্ধীর শাড়ির আঁচল ধরে ক্ষমতার ছড়ি ঘোরাতে। একদা ঊনবিংশ শতকের কলকাতায় 'বাবুদের' এক গুচ্ছ লেজুড় মোসাহেব থাকতো। তারা বাবুর জুড়িগাড়ির পিছনে ছুটতো প্রসাদের লোভে। একবিংশ শতকে সিপিএম পার্টি কংগ্রেস বাবুর ভৃত্য, মোসাহেবগিরি করছে।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির ভরাডুবির পর সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব একটি দলীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল। সেই কমিটির রিপোর্টে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে যেসব কারণে মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন তার মধ্যে মুখ্য হলো পার্টি নেতাদের অস্বচ্ছ ভাবমূর্তি। এটাই যদি অন্যতম কারণ হয়ে থাকে তা হলে স্বীকার করতেই হবে পার্টি অনেক আগেই আদর্শচ্যুত হয়েছে। ধান্ধাবাজির রাজনীতিই সিপিএমকে ডুবিয়েছে। অথচ সেই ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব রাজনীতিকেই পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী নেতারা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করছেন। গত তিন দশক ধরে এই জাতীয় সিপিএম নেতারা যে জীবনযাপন করেছেন তাতে দিনে দিনে এই ধারণাই তাঁদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে যে দল নয়, ব্যক্তিই বড়। এই প্রসঙ্গে হুগলি জেলার নেতা অনিল বসুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি সস্ত্রীক সভা করে দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুমকি দেন। অবাক হতে হয় যখন দেখি পার্টির পক্ষ থেকে কেউ অনিলবাবুদের মতো নেতাদের চ্যালেঞ্জকে বাধা দেয় না। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা হঠাৎ গজায়নি। ক্ষমতার শীর্ষে বসে হাতে মাথা কাটা এইসব সিপিএম নেতাদের উল্টে যথেষ্ট তোল্লাই দেওয়া হয়েছে। যেমন, ভাত ছড়িয়ে অনেক কাক ডেকেছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ শেঠ, কান্তি গাঙ্গুলি, অমিতাভ নন্দী, অশোক ভট্টাচার্যরা। সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকেদের কাছে মার্কসবাদী আদর্শের কোনও মূল্যই নেই। এইসব পার্টির কাকেরা আদতে দালাল বা বাজারের ফড়ে। এরা একদলের বা গোষ্ঠীর দাদার সঙ্গে অন্য দলের দাদার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। বিনিময়ে দালালির মুলোটা-কলাটা খায়। এদের কাছে পার্টির রাজনৈতিক আদর্শের মূল্য কানাকড়িও নয়। তাই একদা লক্ষ্মণ শেঠের ডানহাত হলদিয়ার শেখ মুজফফর সাম্প্রতিক পুর নির্বাচনে

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত শক্ত করতে ময়দানে নেমেছিলেন!

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সিপিএম নেতৃত্ব ভুলে গিয়েছিলেন যে দালাল-ফড়েদের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। এরা সুখের পায়রা। এদের ব্যবহার করে আখের গোছানো যায়। রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় না। সিপিএম দলের এই ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির পেছনে শীতল নিষ্ঠুরতা কাজ করে গেছে বহু বছর। আজ যখন জাতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া সিপিএম নিজেকে সংশোধন না করে সেই আখের গোছানোর রাজনীতিকেই আঁকড়ে ধরছে তখন লালু- মুলায়মদের থেকে বিমান-বুদ্ধদের আলাদা করে দেখা যায় না। অনেকেই হয়তো বলবেন, আদর্শহীনতাই কম্যুনিস্টদের চরিত্র।

১৯৪২ সালে বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর গণআন্দোলনের সময় কম্যুনিস্টরা বৃটিশের চরবৃত্তি করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি সোভিয়েত রাশিয়ার দালাল ছিল। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে তারা চীনের সমর্থনকারী এজেন্ট ছিল। ১৯৬৫-তে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে কম্যুনিস্টরা পাকিস্তানকে সমর্থন করে। সোজা কথায়, ভারতের বিপদে, সংকটে বামপন্থীরা কোনওদিনই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। বিশেষত, সিপিএম নেতারা কে কোন হাঁড়ির ভাত খান এখন সকলেই জানেন। তাই এইসব পরজীবী পরগাছা নেতাদের দেশের মানুষ আর বিশ্বাস করেন না। সিপিএম রাষ্ট্রপতি পদের দৌড়ে কংগ্রেস প্রার্থী প্রণববাবুকে সমর্থন করছে স্রেফ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি-র পালের হাওয়া কেড়ে নিতে। সাম্প্রতিক পুরসভাগুলির নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের হার শতাংশের হিসাবে কিছুটা কমেছে। কিন্তু সেই ভোট বামেদের পক্ষে যায়নি। ভোট বেড়েছে বিজেপি'র। বরং সিপিএমের লালদুর্গ বলে পরিচিত হলদিয়া, দুর্গাপুর এবং ধুপগুড়িতে বামেদের ভোট যথেষ্টই কমেছে। আলিমুদ্দিনের ম্যানেজারদের এই তথ্য অজানা নয়। তারা বুঝে গেছেন, দলীয় নীতি-আদর্শের বুলি কপচিয়ে কর্মীদের চাঙ্গা করা যাবে না। রাজ্যের সব জেলাতেই দলীয় নেতৃত্ব এখন গোষ্ঠীতন্ত্রের শিকার। তাই পার্টি এখন চাইছে প্রণববাবুকে সমর্থন জানিয়ে বাঙালির আবেগকে চাগিয়ে তুলতে। এই আবেগের হাওয়ায় ভর করে দলের নৌকা ভাসিয়ে লোকসভায় নির্বাচনে বাজিমাৎ করতে চায় পার্টি। বাস্তবে তা কি সম্ভব? মনে হয় না। প্রণববাবু যে কতটা বাঙালি আর কতটা দিল্লীওয়ালা সে কথাটা এই রাজ্যের শিশুরাও জানে। প্রণববাবু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সবটাই দিল্লীতে কাটিয়েছেন। বীরভূমের কীর্ণাহারের এই সন্তান তাঁর গ্রাম মিরিটিতে পৈতৃক বসতবাড়িটিকে দু' মহলা পাকা বাড়ি করেছেন। কিন্তু গ্রামের উন্নতির জন্য একটি কপর্দকও তিনি ব্যয় করেননি। তাঁর গ্রামের একমাত্র পাকা বাড়িটি প্রণববাবুর। গ্রামে আর দ্বিতীয় পাকা বাড়ি নেই। এরপরেও সিপিএম ভাবছে, বাঙালির আবেগ তাকে পশ্চিমবঙ্গে আবার ক্ষমতায় ফেরাবে! □

নেত্রদান মহাদান

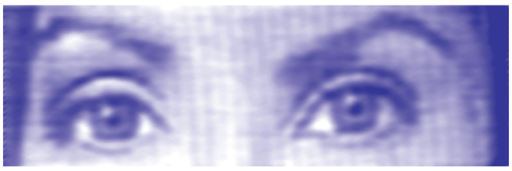

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

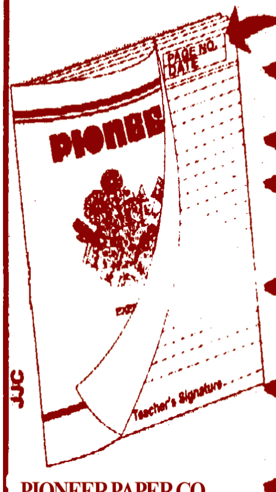

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অমলেশ মিশ্র

হিন্দীতে প্রবাদ আছে— 'অধজল গাগরি ছলকত্ যায়।'ইংরাজীতে সমার্থক প্রবাদ 'এম্‌প্টি ভেসেল সাউন্ডস্ মাচ্।' আমাদের বাংলায় বলে— ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশী।'

কলসীতে যখন অর্ধেক জল থাকে সেই জল

ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে। পাত্র যখন শূন্য থাকে তখন তার শব্দ বেশি হয়। যে ঢেঁকি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে সেই ঢেঁকির শব্দ বেশি হয়।

সংস্কৃতে বলে— গণ্ডুষ জল মাত্রেন সফরী ফরফরায়তে, অগাধ জল সঞ্চারি বিকার ন চ রোহিত। পুঁটি মাছ এক গণ্ডুষ জলে ভীষণ ফর্‌ফর্ করে, অথচ গভীর জলে যে রুই মাছ থাকে তার কোন ফড়ফড়ানি নাই।

ভারতবর্ষের এক নম্বর নাগরিক তথা রাষ্ট্রপ্রধান— রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন হবে ১৯ জুলাই। নির্বাচিত ব্যক্তির নাম ঘোষণা হবে ২২ জুলাই। নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে ১৬ জুন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন। মোট ভোটার ৪৮৯৬ জন। এরা সকলেই জনপ্রতিনিধি— সাংসদ ৭৭৬ জন এবং বিধায়ক ৪১২০ জন। কিন্তু সব বিধায়কের ভোটমূল্য সমান নয়। একটি রাজ্যের জনসংখ্যা ও বিধায়ক সংখ্যার অনুপাত হিসাবে বিধায়কের ভোটমূল্য হিসাব করা হয়। কোনও বিধায়কের ভোটমূল্য বেশি কারুর বা কম হতে পারে। তবে এই মোট ৪৮৯৬ জনের মোট ভোট মূল্য ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৮২। এর অর্ধেকের থেকে ১ ভোট যিনি

> প্রণববাবুকে সমর্থন করবেন না মমতা। তাহলে কি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পি এ সাংমাকে সমর্থন করবেন? সাংমা হয়ত জিতবেন না কিন্তু তাঁকে ভোট দিয়ে প্রণব বিরোধিতার রূপটিকে রূপ দেওয়া যায়। আরও সুবিধা হয়েছে যে সিপিএম সমর্থন করছে না সাংমাকে।

বেশি পাবেন, তিনিই নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন। অর্থাৎ জয়ী প্রার্থীকে ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৪২ মূল্যের ভোট পেতে হবে, এই সাংসদ ও বিধায়কদের কাছ থেকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দল পরিচালনা করেন সেই দলের সকল সাংসদ ও বিধায়কদের সর্বমোট ভোট মূল্য প্রায় ৪৪ হাজার অর্থাৎ মোট ভোট মূল্যের ৪ শতাংশ মাত্র। প্রশ্নটা উঠেছে যে, মাত্র ৪ শতাংশ ভোট যার দখলে তিনি এই নির্বাচন নিয়ে এত সোরগোল করছেন কেন? এবং এই সোরগোল অর্ধেক জলভরা কলসীর মতো, এম্‌প্টি ভেসেলের মতো, ফোঁপরা ঢেঁকির মতো অথবা পুঁটি মাছের সোরগোলের মতো কি না!

কেউ কেউ বলতে পারেন—তীতীর্ষু দুস্তরং মোহা দুডুপেনাস্মি সাগরম্ অর্থাৎ মমতা দেবী ভেলায় চেপে সমুদ্র পেরানোর চেষ্টা করছেন যেমন মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ রচনার আগে বলেছিলেন। বস্তুত কালিদাসের উপমাটা প্রাসঙ্গিক হচ্ছে না। কারণ কালিদাস ওটা অহংকারে বলেননি, বিনয়ে বলেছিলেন। আর 'বিনয়' ব্যাপারটা শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাতে আছে এমন উদাহরণ একটিও সম্ভবত নেই। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল-এর মতো কিছু প্রয়াতের প্রতি তার বিনয়ের প্রকাশ দেখা গেছে মাত্র। তবে সেই সব বিনয়, ভাবে না অভাবে— তাও খুব পরিষ্কার বোঝা যায় না।

সে যাই হোক, শ্রীমতী যথেষ্ট সোরগোল ফেলেছেন ঠিকই— কিন্তু এই নির্বাচনে তিনি বা তার দল কতটা প্রাসঙ্গিক বা আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা সেটাই আলোচনা করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম শরিক হিসাবে আশা করা গেছিল যে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীকে এই নির্বাচনে সমর্থন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারটি যে দলগুলি যৌথভাবে চালাচ্ছে (ইউ পি এ) কংগ্রেস তাদের মধ্যে প্রধান দল। তৃণমূল কংগ্রেসকে বাদ দিলে ওই জোটভুক্ত দলগুলির ভোটমূল্য মোট ভোটের ৩৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার। এখন জানা যাচ্ছে সোস্যালিস্ট পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, জনতা দল (ইউ), শিবসেনা এবং জনতা দল (এস) প্রভৃতি দলগুলি কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করবে— এদের ভোট মূল্য ১ লক্ষ ৭৭ হাজারের বেশি অর্থাৎ কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে ভোট দাঁড়াচ্ছে ৪ লক্ষ ১০ হাজার + ১ লক্ষ ৭৭ হাজার অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৮৭ হাজারের মতো। জয়ের জন্য প্রয়োজন ৫ লক্ষ ৫০ হাজার-এর মতো।

কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষিত হয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সমর্থন করবেন না— যদিও তিনি কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গ। তিনি তাঁর মতোই একটি ছোট দলের সঙ্গে যৌথ বৈঠক করে তিন জনের নাম ঘোষণা করলেন ওই পদের প্রার্থীর জন্য। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই তিন জনের কারুর সঙ্গেই শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও পূর্বালোচনা করেননি। তাঁর প্রথম পছন্দ এ পি জে আব্দুল কালাম। যিনি একসময় সর্বসম্মত রাষ্ট্রপতি

হয়েছিলেন। শ্রীমতী একবারও ভাবলেন না এই প্রার্থী নিশ্চিত জয় না জেনে প্রার্থী হবেন না। তাঁর সম্মান যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা অঙ্কের হিসাবে। তার দ্বিতীয় প্রার্থী মনমোহন সিং। তিনি তাঁর নাম প্রার্থী করে পরোক্ষ সকলকে বোঝালেন যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের অযোগ্য, তাঁকে বরং সাংবিধানিক প্রধান অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি করে দেওয়াই ভাল। তাঁর তৃতীয় নাম প্রাক্তন সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন স্পীকার সোমনাথ চ্যাটার্জী। কেন যে এই নামটি প্রস্তাব করা হয়েছে— তা আদৌ বোঝা গেল না। এবং শ্রীমতীও এই তিন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করার পিছনে কী যুক্তি আছে তা ব্যাখ্যা করেননি। তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন মুলায়ম সিং যাদব অর্থাৎ সোস্যালিস্ট পার্টিকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই দল প্রণববাবুকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করল। সেই দলের ভোট মূল্য ৬৬ হাজার ৬৮৮।

প্রশ্ন দাঁড়াল, মুলায়ম সিং এর মতো এক নেতা এবং তাঁর দলের উপর কী ভরসায় শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় সমরে নামলেন? সোস্যালিস্ট পার্টি বর্তমান কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করছে। রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস প্রার্থীকেও সমর্থন করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের ভোট মূল্য মোট ভোটের মাত্র ৪ শতাংশ হওয়ায় তার পক্ষে মাথা হওয়া সম্ভব নয়, লেজ হয়েই থাকতে হবে। যদি কোনও সময় লেজের ইচ্ছায় মাথা নড়ে সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা আসবে। তার আগে লেজকেই মাথার ইচ্ছায় নড়তে হবে। তবু মমতা দেবীর শব্দ এত বেশি কেন? সে তো হবেই। ফোঁপরা হলে শব্দ বেশী হবে, এম্‌প্টি হলে সাউন্ড বেশি হবে, সফরি গণ্ডুষ জলেই ফর্‌ফর্‌ করবে।

রাজনীতিতে প্রদর্শনবাদিতার মূল্য একটা আছে। নেতাদের মধ্যে প্রদর্শনকামীরও অভাব নেই। মমতা দেবী প্রচারের আলোয় থাকতে ভালবাসেন। হাস্যকর কিছু করে প্রচারের আলোতে আসাও যায়। স্থায়িত্ব কতকাল তা পরে বিবেচ্য। মমতা দেবীর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী এই বয়সে ১০ বছরের কাজ এক বছরেই করে দিয়েছেন। ফলে তিনি মনে করেন রাজ্যের রাজ্যস্তরের রাজনীতি থেকে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে তাঁর যাওয়ার সময় হয়েছে। এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রসঙ্গটি সেই পথের প্রথম গাড়ী যাতে তিনি একটি টিকিট চাইছেন। রাষ্ট্রপতি যিনিই হউন, মমতা দেবীকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়ে তিনি যেন তা না হতে পারেন।

মাটির হাঁড়ি, কলসী সূর্যের খরতাপ সহ্য করতে পারে— তার মানে এই নয় যে সেটি ষাঁড়ের শিং-এর গুঁতো সহ্য করতে পারবে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রণব মুখার্জীর নাম রাষ্ট্রপতি পদের ঘোষণা করার পিছনে এই কাজে কংগ্রেস দলের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর একটি মতলব বোঝা যায়। ২০১৪-র নির্বাচনে প্রণববাবুকে কংগ্রেসের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করার অপ্রীতিকর দায় থেকে সোনিয়া মুক্ত হয়ে গেলেন। এবার তাঁর সুযোগ থাকল রাহুল থেকে উপর দিকের যে কোনও বোড়ে কে তিনি ওই পদের জন্য মনোনীত করতে পারবেন। প্রণববাবু যদি ওই দৌড়ে নামেন তবে জিতে যাওয়ার সম্ভাবনাটা প্রবল। সোনিয়া লবির পক্ষে তা গিলে ফেলা মুস্কিল। প্রণববাবুও বুঝেছেন যে অনিশ্চিত প্রধানমন্ত্রিত্বের থেকে বা বিরোধী দলের সংসদীয় নেতার পদের থেকে নিশ্চিত রাষ্ট্রপতির পদ তাঁর এতদিনের রাজনীতির পরম পুরস্কার। সোনিয়া গান্ধী এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় উভয়েই জানেন যে এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রাসঙ্গিক নয়। তৃণমূলের ভোট ছাড়াই কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত। এখন তো আবার সিপিএম এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থন জানাচ্ছে। এন ডি এ-র একটি অংশ জে ডি (ইউ) এবং শিবসেনা এবং বামফ্রন্টের একটি অংশ সিপিএম এবং ফরওয়ার্ড ব্লক এখন কংগ্রেসের পাশে এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে।

বামফ্রন্টে ভাঙ্গন বা এন ডি এ-তে ভাঙ্গন, ইত্যাদি যাঁরা প্রচার করছেন— তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকেই অক্সিজেন দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। সংসদীয় নির্বাচনে জোটের ভিত্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কে কাকে ভোট দিয়েছেন সেই অনুসারে হবে না। ইউ পি এ-র প্রতিদ্বন্দ্বী জোট হিসাবে এন ডি এ-র রাজনৈতিক দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী দেওয়ার। সেদিক থেকে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও প্রার্থী দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে এন ডি এ-ভুক্ত জোটের কেউ অসম্মতি জানাতে পারেন এবং ইচ্ছামতো সমর্থন জানাতে পারেন। এতে জোটের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পি এ সাংমাকে যে দলগুলি সমর্থন জানাচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনে তারা একই জোটভুক্ত হবে এমন না হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সারা দেশের পক্ষে কোনও গুরুতর বিষয়ও নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রধানমাত্র। প্রয়োজনে তিনি পরামর্শ দিতে পারেন মাত্র। তাও গ্রাহ্য না হতে পারে। তিনি মোটামুটি মন্ত্রিসভার বশংবদই থাকেন। তাই রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সাধারণ মানুষের ও সামগ্রিক দেশের স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্কযুক্ত বিষয় নয়।

এই ধরনের একটি নন-ইস্যুকে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্যু করে নিলেন জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নিজের উপর আলোকপাত করানোর জন্য। তাঁর বিশ্বস্ত গৃহ (ট্রাস্টেড হোম) মুলায়ম সিং যাদব তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা (বিট্রে) করেছেন। তিনি এখন একেলা। অনৈতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার যে আহ্বান যুব সমাজকে তিনি তাঁর ফেসবুকে দিয়েছেন তা চোরের মুখে ধর্ম কথার মতো। এন ডি এ-র সঙ্গে তিনি যা করেছেন তার পর আর ওইসব কথা তার মুখে ভুল স্বীকারের আগে মানায় না। কিন্তু এও তার সমগ্র ঢপবাজির একটি অংশ, জাতীয় রাজনীতিতে ভেসে থাকায় একটি চেষ্টা— যা শোভন হোক বা না হোক শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেমানান নয়।

প্রণববাবুকে সমর্থন করবেন না মমতা। তাহলে কি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পি এ সাংমাকে সমর্থন করবেন? সাংমা হয়ত জিতবেন না কিন্তু তাঁকে ভোট দিয়ে প্রণব বিরোধিতার রূপটিকে রূপ দেওয়া যায়। আরও সুবিধা হয়েছে যে সিপিএম সমর্থন করছে না সাংমাকে। সাংমা বিজেপি-প্রস্তাবিত প্রার্থীও নন। তাঁর নাম প্রস্তাব করেছে--- অ-সিপিএম, অ-বিজেপি, অ-এনডিএ— বিজেডি দল এবং এ আই এ ডি এম কে দল।জে ডি (ইউ) এবং শিবসেনাকে বাদ দিয়ে যে এন ডি এ-তে থাকছে তার সাংসদ ও বিধায়কদের ভোট মূল্য ২ লক্ষ ৪৩ হাজার। এর সঙ্গে এ আই এ ডি এস কে (৩৬,৯২০) এবং বিজেডি-র (৩০,১২৫) ভোট যুক্ত হলে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার। তৃণমূল সমর্থন জানালে তা হয়ত চার লক্ষ হবে। তাই জয় সম্ভব নয়।

তাহলে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াল? তিনি কংগ্রেসকে সমর্থন করলেন না। তাঁর নেতৃত্বে মুলায়ম সিং-এর সহযোগিতায় কোন তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করার মনোবাসনা (যার সাহায্যে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রাসঙ্গিক হওয়া) সফল হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত থাকল না। এখন হয় সাংমা না হয় সদ্‌মা। ☐

চিঠিপত্র

নজিরবিহীন সংবর্ধনা

বিনোদন ও বাণিজ্যকেন্দ্রিক একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হিসেবে আই পি এলকে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন ফ্রাঞ্চাইজি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ‘রাজার খেলা’ ক্রিকেটকে ব্যবসায় পরিণত করেছেন। বিভিন্ন দলের কর্ণধার হিসেবে কোনও নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অন্য কোনও কোটিপতি ব্যক্তিরা যুক্ত রয়েছেন। এহেন একটা দল কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর অন্যতম কর্ণধার হলেন অভিনেতা শাহরুখ খান। আই পি এল টুর্নামেন্টে এই দলের চ্যাম্পিয়নের খবরে বাংলার ক্রিকেট প্রেমীদের উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের বাঁধনছাড়া উন্মাদনা প্রকাশ করা একটা অকল্পনীয় ঘটনা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। যে কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রী একজন সম্মানীয় পদাধিকারী ব্যক্তি। কিন্তু ইডেনে কিং খান ও তাঁর দলবলের সঙ্গে তাঁরা যেভাবে উন্মাদনা প্রকাশ করলেন তা বড়ই বেমানান। এমনকি নাচের তালে তাল পর্যন্ত দিলেন। সর্বোপরি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে শাহরুখ খানের চুম্বন করার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়— তা বলা যায়। মাননীয় রাজ্যপাল আবার এই সাফল্যকে ‘প্রকৃত পরিবর্তন’ বলে মন্তব্য করেছেন। যদিও পরে তিনি একথায় ডিগ্‌বাজি খেয়েছেন। কিন্তু মহাকরণ থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘসময় একটা দলের জয়ের আনন্দে উল্লসিত হওয়ার নেপথ্যে যৌক্তিকতা আছে কি? না কি এর জন্য কোনও পরিকল্পনা মাফিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে? এ ঘটনা ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দকেও ম্লান করে দেয়। অথচ রাজ্যে পেট্রোলের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির জন্য কিন্তু তৃণমূল নেত্রী তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সেভাবে সদর্থক ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। অথচ তিনি আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আই পি এলের মতো বাণিজ্যিক টুর্নামেন্টে একটা দলের জয়ের আনন্দে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। রাজ্যে যখন আর্থিক দুরবস্থা চলছে তখন এ ধরনের বিলাসিতাকে সমর্থন করা যায় না। রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন দুর্বলতাকে চাপা দিতেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্যত্র আকর্ষণ করারও যে এটা একটা কৌশল তা বলা যায়। ভারতের কোনও রাজ্যে এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ নেই। অর্থাৎ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এটা নজিরবিহীন ঘটনা। আই পি এলের দৌলতে এই অতিরঞ্জিত রাজকীয় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে কয়েক লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে যেভাবে মাতামাতি করা হলো তাতে রাজ্যের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে কিছুটা হলেও ত্বরান্বিত করলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তা বলতে দ্বিধা নেই। সত্যিই! মুখ্যমন্ত্রীর এ ব্যাপারে তুলনা হয় না।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

১৫ বছরেই সাবালিকা

সংবাদে প্রকাশ (উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্রিক ৬.৬.১২) মুসলিম মেয়েরা ১৫ বছর বয়সে বিবাহ করিতে পারেন। অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সেই মুসলিম মেয়েরা সাবালিকা হয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে ভারতীয় আইনে হিন্দু মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের কমে বিবাহ দিলে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৮ বছর বয়স না হলে হিন্দু মেয়েরা সাবালিকা হতে পারেন, ওদের ভোট দেওয়ার অধিকারও দেওয়া হয় না। ১৮ বছরের কম বয়সে কোনও হিন্দু মেয়ের বিবাহ দিলে নাবালিকা বিবাহ দেওয়ার অপরাধে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ছেলে-মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে যৌবনের চিহ্ন শরীরে প্রকাশ পায়, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই।

বিবাহ কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, সামাজিক ব্যবস্থা। যৌনজীবন- যাপন করার সামাজিক স্বীকৃতি মাত্র।

একই জল-হাওয়ায় হিন্দু, মুসলিম পাশাপাশি বাস করছেন, সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতে কারও দেহে যৌবন আসে না। ধর্মের ভিত্তিতে সাবালিকা/নাবালিকা নির্ধারণ করা উচিত নয়।

মুসলিম মেয়েরা যদি ১৫ বছর বয়সেই সাবালিকা হয়, তবে ওদের এ বয়সেই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। যেহেতু, ১৫ বছর বয়সেই সাবালিকা হয়ে বিবাহ করে স্বামীর সহিত বসবাস করছেন।

একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে বিবাহের বয়সের পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

স্বাগত নবাঙ্কুর

সাপ্তাহিক স্বস্তিকাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। কারণ বহুদিন আগে স্বস্তিকাতে ‘অঙ্কুর’ নামে ছোটদের একটি পাতা থাকত। সুবন্ধুর পরিচালনায়। আমি স্বস্তিকার সেই ষাটের দশক থেকে এক গুণমুগ্ধ পাঠক।

স্বস্তিকা হাতে পেলে প্রথমে অঙ্কুর পাতাটা আগে দেখতাম বা পড়তাম।

পুনরায় নবাঙ্কুর নামে যে দুটি পাতা ছোটদের বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে আমি যারপরনাই আনন্দিত। এখন প্রথমেই নবাঙ্কুর পড়তে শুরু করি। আগামী পূজা সংখ্যায় নবাঙ্কুর বিভাগে ছোটদের মতো শিক্ষামূলক গল্পসহ কবিতা বা অন্যান্য বিষয় থাকে তার ব্যবস্থা করবেন। স্বস্তিকার কাছে আমার এই বিনম্র অনুরোধ।

—সুনীল বিষ্ণু, সিউড়ী, বীরভূম।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন

মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

দেশ চলছে ভগবান ভরসায়

ডাঃ অজিত কুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে দেশের নেতাদের মধ্যে কেমন যেন দ্বি-মতের স্বার্থান্বেষী প্রবণতা দেখা যায়। স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের দেশে এত পার্টি ছিল না। ছিল রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস। শুরু থেকে এই কংগ্রেস পার্টির পদ নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে টানাটানি ছিল। এই কংগ্রেস পার্টির মধ্যে যখনই সমস্যা দেখা দিত তখনই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসকে কংগ্রেসের সভাপতি বানিয়ে দেওয়া হোত। আবার যখন পার্টি মজবুত হোত, তখন নেতাজীকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোত। এইভাবে রেষারেষি চলতেই থাকে। ত্রিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাজীকেই কংগ্রেস সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। এবং গান্ধীর লোকেরা যখন হেরে যায়, তখন গান্ধী নিজের লোকদের বলেন, তোমাদের হার হয়নি, এটা আমারই হার বলে আমি মেনে নিচ্ছি। অর্থাৎ সবাই দল থেকে পদত্যাগ করুন। তাহলে সভাপতির কোনও মর্যাদা থাকবে না। তখন গান্ধী নিজের মতো করে কংগ্রেস সাজিয়ে নিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি তৈরি করলেন। দেশ স্বাধীনতার গন্ধ পাওয়া মাত্র কিছু ভারতীয় নেতা আর ইংরেজরা মিলে সুভাষচন্দ্র বোসকে উধাও করেছিল। তাঁর সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। এবং ভারতের নেতারা এব্যাপারে ঠিকমত খোঁজ-খবর করার চেষ্টাও করেননি। এর মধ্যে গুঁতোয় পড়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যায়। তারা প্রশ্ন তোলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? সে সময় নেতারা বসে যে নির্বাচন করেন তাতে সর্দার প্যাটেলের পাল্লা ভারী দেখায়। এখানেও গান্ধী মেনে নিতে পারলেন না। অবশেষে তিনি নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেন। কারণ গান্ধীকে সবাই কমবেশী সম্মান করত। ওদিকে জিন্না ইংরেজদের ইশারায় পাকিস্তানের দাবী করল। এবং যুক্তি দিয়ে বলল হিন্দু-মুসলমান আলাদা জাতি, এদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-ব্যবহার সবই আলাদা, অতএব এরা এক জায়গায় বসবাস করতে পারবে না। অর্থাৎ আমাকে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামক একটি দেশ দিন। তখন ১৭ শতাংশ মুসলিমদের জন্য ২৩ শতাংশ জায়গা দিয়ে দেওয়া হলো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আর প্যাটেল বললেন, তাহলে পুরো লোক বিনিময় করা হোক। কিন্তু নেহরু-গান্ধী দেখলেন পুরো লোক বিনিময় হলে তাঁদের ভোট ব্যাঙ্কে আঘাত লাগতে পারে। তাই তাঁরা পুরো লোক বিনিময় করলেন না। সর্বকালের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে গেলেন। কোনও কোনও জায়গায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হলো এবং প্রচুর লোক মারা গেল। তাতে নেহরু গান্ধীর শোকতাপ রইল না। দেশ তিন ভাগে বিভক্ত হলো। এই কার্যকলাপ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আর সর্দার প্যাটেল মেনে নিতে পারলেন না। দ্বিমত চলতে থাকে, কিছুদিন পরে সর্দার প্যাটেল মন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। দাঙ্গা কবলিত কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বড় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু ঘটল। সারা দেশ বা বাংলার মানুষ শ্যামাপ্রসাদের সমর্থনে আন্দোলনের জন্য রাস্তায় নেমে পড়ল। হাওয়া খারাপ বুঝে গান্ধী-নেহরু বড় চতুরতার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ঘটনাকে ভোলানোর জন্য, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর বিপক্ষের নেতা জ্যোতি বসুকে দিল্লীতে ডেকে নিলেন। এবং এই দুই নেতার কানে কানে গুরুমন্ত্র দিলেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কলকাতায় এসেই ট্রামের ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন। ওদিকে বিপক্ষের নেতা জ্যোতি বসু ট্রাম ভাড়া নিয়ে আন্দোলনে নেমে পড়লেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর আন্দোলন লুপ্ত হয়ে গেল। নেহরুর জয়জয়কার হলো। ১৯৬৪ সালে নেহরু মারা যান, দেশ চালাবার জন্য অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন গুলজারিলাল নন্দা। কয়েকদিন পরে নির্বাচন হলো এবং নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী (১৯৬৪-৬৬)। আবার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ নিলেন গুলজারিলাল নন্দা। ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলেন। দেশের আমজনতা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যে আশা করেছিলেন তার কিছুই তিনি দিতে পারেননি। দেশের পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে লাগল। দেশের ভাব খারাপ বুঝে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারী করলেন। পরের নির্বাচনে জনতা পার্টির মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হলেন (১৯৭৭-৭৯)। চৌধুরী চরণ সিংহ বছর খানেকের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন (১৯৭৯-৮০)। আবার ইন্দিরা গান্ধী এলেন। ইন্দিরা নিজের দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হলেন। মা-বাবা হারানো ছেলে রাজীব গান্ধীকে বিপুল ভোটে জিতে দেশের গদিতে বসিয়ে দিলেন। ভারতীয় মানুষ তামিল, তারা শ্রীলঙ্কার নাগরিক। তাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে তাদের হাতে রাজীবের মৃত্যু ঘটল। রাজীবের ক্যাবিনেট মন্ত্রিত্ব থেকে বেরিয়ে এসে জনমোর্চা পার্টি গঠন করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং দেশের কিছু কাজ করার জন্য এসেছিল বটে, কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কারণে পদত্যাগ করতে হয়েছিল মণ্ডল আয়োগ-এর জন্য। এবার এলেন চন্দ্রশেখর ১৯৯০-৯১। পরে আসলেন পি.ভি. নরসিংহ রাও ১৯৯১-৯৬। পরে ১৩ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। ১৩ দিনের চমক দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। যে ভারতে এখন দেশ চালানোর উপযুক্ত ব্যক্তি আছে। তারপরে আসলেন দেবেগৌড়া। ইন্দ্রকুমার গুজরাল। কিন্তু কাজের কাজ কোনও প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি।

এবার আসলো অটলবিহারী বাজপেয়ীর পালা। তিনি তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতকে পৃথিবীর শিখরে দাঁড় করিয়ে ১২০ কোটি মানুষের মাথা উঁচু করে দেন। দেশকে চতুর্মুখী বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। স্বাধীন ভারতে এই রকম উপযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আর কেউ হতে পারেনি। বাজপেয়ী পারমাণবিক অস্ত্র, কারগিল যুদ্ধ এবং অন্যান্য দেশের প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখেন। হয়ত বাজপেয়ীর মতো প্রধানমন্ত্রী কেউ হতে পারে কিনা সন্দেহ। আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নাকি অর্থনীতিবিদ্।

এই অর্থনীতিবিদ আসার পর থেকে দেশের দুর্গতি বেড়েই চলেছে। আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি। আর যত প্রকার দুর্নীতি এই সরকারের সময়ে হয়েছে। কালো পয়সা দেশে ফিরিয়ে আনাই সাহস এই সরকারের নেই। কারণ সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। এখন সরকারের উপর কোনও ভরসা না করে ভগবান ভরসায় দেশ চলছে ও আমাদেরও চলতে হবে! ■

বিপুল উৎসাহে জেগে উঠল বিপুল

বাড়ির অবস্থা ভালো না হলেও তিনবেলা ঠিকমতো খাবার পেয়ে শরীরটাকে তাগড়াই করেছিল বিপুল। ওইরকম তাগড়াই চেহারা হলেও কাজকর্ম একটুও করত না। বিশ্রাম নিলে সহজে উঠত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে বসে কাটাত। মা বলত, 'একটু ঘুরে বেড়িয়ে আয়, নয়তো শরীরে খিল ধরে যাবে যে।' কে শোনে কার কথা। বাবা উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। দাদা-ভাইরাও। বিপুল শুধু খেত আর ঘুমোত। বকাঝকা করে কিছু হয়নি। খাবার বন্ধ করেও লাভ হয়নি কোনও। দুতিন দিন না খেয়েও দিব্যি থাকত। শাস্তি কত আর দেওয়া যাবে! বাবার চিন্তা ছিল একটাই, তাঁর অবর্তমানে ওকে কে দেখবে। তিনি ভাবতেন, বিপুলের এই কাজ না করার ইচ্ছের পিছনে কোনও কারণ থাকতে পারে।

বাবার মৃত্যুর পর বাড়িতে অত্যাচার বেড়ে গেল বিপুলের উপর। দাদা-ভাইরা একদিন জানাল, 'তোমাকে আমরা আর দেখবো না। আমরা অন্যজায়গায় বাড়িভাড়া নিয়ে চলে যাচ্ছি। তোমার ভার নিতে পারবো না'। মাকে তারা বৃদ্ধাবাসে পাঠিয়ে দিল। তাঁর কিছু বলার বা করার ছিল না। দাদা-ভাইরা নতুন বাড়ির ঠিকানা দিয়ে যায়নি। বিপুলও চায়নি। বাড়িওলা বলল, 'তোমাকে একবছর সময় দেব। তার মধ্যে নিজে রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে বাড়িতে থাকতে দেব না।'

বিপুল বুঝল, থাকার জায়গাটা রইল আপাতত। কিন্তু খাবার জোগাড় হবে কীভাবে? চুরিটুরি তো করার বিদ্যে নেই। খেটে খাওয়ার অভ্যেস আয়ত্ত হয়নি এখনও। বিপুল কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু খিদের জ্বালা কদিন সামলাবে!

খিদেয় রাতে ঘুম হয় না। ভোরে বেরিয়ে একটা পার্কের ধারে বসে রইল। এক সুগঠিত চেহারার ব্যবসায়ী তাকে দেখতে পেয়ে তাকালেন। বেড়াবার জন্যে পার্কে ঢুকে গেলেন। এক ঘণ্টা বাদে বেরোবার সময় দেখলেন ছেলেটা বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ব্যবসায়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু খাওনি মনে হচ্ছে? পয়সা চাও?' বিপুল এর আগে কোনওদিন কারও কাছে ভিক্ষে চায়নি। এই প্রথম তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা শব্দ : 'দিন।'

ব্যবসায়ী একটা আট আনা বিপুলকে দিলেন। তার হাতে নয়। ছুঁড়ে দিলেন ঝোপের মধ্যে। বিপুল দেড় ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে আট আনা পেল। বিপুল সেই আট আনায় মুড়ি কিনল। দোকানদার মুড়ির সঙ্গে ছোলা আর গুড় দিয়েছিল বাড়তি। কারণ সে শুনেছিল ছেলেটা অসুবিধের মধ্যে আছে। ওইটুকু খাবারে কি আর হবে! পেটভরে জল খেল বিপুল। রাতে ঘুম হলো না। খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। ছটফট করল। ভোরে পৌঁছোল পার্কের ধারে।

সকালে সেই ব্যবসায়ী পার্কে ঢুকলেন। ঢোকার মুখে বিপুলকে দেখে বললেন, 'পয়সা পেয়েছিলে কাল?' বিপুল ঘাড় নেড়ে জানাল 'পেয়েছি'। তার মনে হলো, ব্যবসায়ী আজও কিছু দিতে পারেন। যদি দেন তাহলে কিছু খাওয়া যাবে। নয়তো পেটে গামছা বেঁধে শুধু জল খেয়ে থাকতে হবে।

পার্ক থেকে বেরোবার সময় ব্যবসায়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'খেতে হবে তো! পয়সা চাই?' বিপুল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ব্যবসায়ী পকেট থেকে টাকার থলি বের করে একটা টাকা ছুঁড়ে দিলেন বিপুলের দিকে। টাকাটা পাক খেয়ে গিয়ে পড়ল পাশের নালার মধ্যে। নালাটার জল একেবারে নোংরা ভর্তি। দুর্গন্ধযুক্ত। বিপুল বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজার পর টাকাটা পেলো। চানটান সেরে সে খাবারের জন্যে মুড়ির দোকানে গেলো। মুড়িওলা অনেক বেশি খাবার দিল আগের দিনের থেকে। এক টাকার থেকে বেশি তো বটেই। বিপুল মুড়ি আর জল খেয়ে খিদে মেটাল। রাতে খিদের জ্বালায় ছটফট করল। কিন্তু কে তাকে খাবার দেবে?

ভোরে পার্কের ধারে বসে রইল। সকালবেলা সেদিনও হাজির হলেন ব্যবসায়ী। জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাকে কাল টাকা দিয়েছিলাম, পেয়েছো?' বিপুল ঘাড় নাড়ল। ব্যবসায়ী বললেন, 'বসো আমি আসছি।'

এক ঘণ্টা বেড়িয়ে ব্যবসায়ী ফিরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাতে খাওয়া হয়নি?' বিপুল তাকিয়ে রইল। ব্যবসায়ী টাকার থলি খুলে সেদিনও একটা টাকা ছুঁড়ে দিলেন বিপুলের দিকে। টাকাটা গিয়ে পড়ল নালায়। এই নালাটা শুধু দুর্গন্ধভরা নয়, পোকামাকড় কিলবিল করছে। টাকাটা খুঁজে বের করতে না পারলে খাওয়া হবে না কিছু। বিপুল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর মিলল মুদ্রাটা।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে খেলো সে। মুড়িওয়ালা বলল, 'রাতে কিছু খাবে। তাহলে ঘুমোতে পারবে।'

পরের দিন সকালে পার্কের ধারে দাঁড়িয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী এলেন। বললেন, 'কাল টাকাটা পেয়েছিলে?' বিপুল আজ ঘাড় নাড়ার সঙ্গে বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।' ব্যবসায়ী বললেন, 'আমি ঘুরে আসি তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো।'

বিপুল বসে রইল। ব্যবসায়ী এক ঘণ্টা বাদে ঘুরে বাড়ি ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি প্রশ্ন আছে তোমার? বিপুল বলল, 'আপনি তিনদিন আমাকে করুণা করে কিছু অর্থ ভিক্ষে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনে আট আনা। তারপর দু'দিন এক টাকা করে। আমার মনে খটকা লেগেছে, টাকা সরাসরি আমার হাতে না দিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে দিলেন যা গিয়ে পড়ল ঝোপে, কিংবা নালায়। আমাকে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্ট করে খুঁজতে হলো।'

ব্যবসায়ী হেসে বললেন, 'তোমাকে দেখে আমারও মনে হয়েছে, সুগঠিত চেহারা তোমার। কিন্তু পরিশ্রম না করে দিন কাটানোর ইচ্ছে কেন? বাঁচতে গেলে পেটপুরে খেতে হবে, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে হবে, সেজন্যে পরিশ্রম করে টাকা রোজগার দরকার। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তুমি পরিশ্রমে তৈরি কিনা। পরীক্ষা করে দেখলাম, তুমি কুঁড়ে নও। পরিশ্রমী। আমার বিশ্বাস তোমার সামনে অনেক পথ খোলা আছে কাজের। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে পরিশ্রমের বিনিময়ে পাওয়া টাকার দাম বা মর্যাদা কতটা।'

বিপুলকে কে যেন নাড়িয়ে দিল। ব্যবসায়ী ওইদিন কিছু না দিয়ে চলে গেলেন।

পরেরদিন সকালে পার্কে বেড়াতে গিয়ে বিপুলের খোঁজ পেলেন না ব্যবসায়ী। পরে খোঁজ নিয়ে জানলেন, বাজারে এক দোকানে কাজ নিয়েছে বিপুল। ভোরে উঠে বাড়িবাড়ি দুধ আর কাগজ পৌঁছে দেয়। বিকেলেও তার কাজ আছে। যারা বিপুলকে কুঁড়ে বলে জানত তারা দেখল তাজা ছেলেটা কতরকম কাজ করছে। সারাদিনই ব্যস্ত। কেউ জানতে পারেনি, একজন কীভাবে তাকে অন্যভাবে জীবনের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি অর্জন করতে শিখিয়ে গেল। বিপুল এখন অন্যমানুষ। ▯

ঐতিহাসিক দুর্গ প্রতাপগড়

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত পাহাড়ী পর্যটনস্থল ‘মহাবালেশ্বর’ থেকে ২২ কিমি দূরে, অতীতের ঘন অরণ্য ‘জাওলী’ অঞ্চলে অবস্থিত শক্তিশালী প্রতাপগড় দুর্গ। দুর্গম সহ্যাদ্রি পর্বতমালার বুকে সুউচ্চপর্বত ‘ভোরপ্যা ডোঙ্গরা’র শীর্ষে ১০৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত প্রতাপগড় ছিল মারাঠা ‘স্বরাজ্যে’র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। প্রতাপগড়ের রণকৌশলগত এবং দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান--- পূর্বে প্রকাণ্ড মহাবালেশ্বর পর্বত, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে ভয়ংকর গভীর খাদ ও জাওলীর গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি প্রভৃতির ফলে দুর্গ শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হওয়া ছিল কল্পনাতীত। দক্ষিণপূর্বে দুর্গের নিম্নতম অংশ, শক্তিশালী দুর্ভেদ্য বুরুজগুলি দ্বারা সুরক্ষিত, যাদের উচ্চতা প্রায় ১০-১২ মিটার। দুর্গের উত্তরপূর্বে উচ্চতম অংশে অবস্থিত স্বয়ম্ভু কেদারেশ্বর মহাদেবের মন্দির যেটি ছত্রপতি শিবাজী দ্বারা স্থাপিত ও নির্মিত। তুলজাপুরের ভবানী মন্দিরের আদলে প্রতাপগড়ে ১৬৬১ সালে মা তুলজা ভবানীর মন্দির। এছাড়া দুর্গের অন্যতম দর্শনীয় স্থলগুলি হলো ১৭ ফিট উচ্চ অশ্বপৃষ্ঠে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের বিখ্যাত ব্রোঞ্জের সুবিশাল মূর্তি, ‘আফজল স্তম্ভ’। যার তলায় নৃশংস আফজল খানের দরগা প্রভৃতি। শিবাজীর আদেশে মহামন্ত্রী মোরোপন্ত ত্র্যম্বকরাও ১৬৫৬ সালে প্রতাপগড় দুর্গ নির্মাণের কার্য সম্পূর্ণ করেন। শিবাজী প্রতাপগড়ের সাহায্যেই দুর্গম জাওলী অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শিবাজীর নেতৃত্বে উদীয়মান হিন্দু ‘স্বরাজ্য’কে সমূলে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে ১৬৫৯ সালে নৃশংস আদিলশাহী সেনাপতি আফজল খানের নেতৃত্বে সুবিশাল আদিমশাহী বাহিনী ‘স্বরাজ্যে’র অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা সাধারণ প্রজার ওপর অমানবিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালায় এবং তুলজাপুর ও পণঢরপুর প্রভৃতি দেবস্থান চূর্ণ করে প্লাবনের ন্যায় ধেয়ে আসে রাজধানী রাজগড়ের দিকে। এই অবর্ণনীয় অত্যাচারের প্রতিকার করতে ও আফজল খানকে তার পৈশাচিকতার শাস্তি দিতে শিবাজীরাজে তার বীর মারাঠা যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতাপগড়ে আশ্রয় নেন। শিবাজী অভূতপূর্ব কূটনীতি ও কৌশল দ্বারা আফজলকে তাঁর বিপুল বাহিনী সমেত সহ্যাদ্রির বুকে দুর্গম জাওলীর জঙ্গলে টেনে আনতে সফল হন। প্রতাপগড় থেকেই উভয়পক্ষের মধ্যে দূতের মাধ্যমে বার্তালাপ হয়। অচিরেই শিবাজী, বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যার আফজল খানের যে চক্রান্ত, তার আভাস পেয়ে যান। তিনি কানহোজি নায়েক জেধে, রামোজী ধামাল প্রভৃতি বিচক্ষণ সর্দারদের সঙ্গে প্রতাপগড় দুর্গের পাদদেশে আফজল খানকে বধ করার দুঃসাহসী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। শিবাজীর দূত পন্তাজী কাকার অভূতপূর্ব বাকচাতুর্যে আফজল প্রতাপগড়ের পাদদেশে শিবাজীর সহিত একান্ত সাক্ষাতে রাজি হন।

১০ নভেম্বর ১৬৫৯, ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের দিন, প্রতাপগড়ের পাদদেশে অপূর্ব কারুকার্যখচিত শামিয়ানায় নিচে মিলিত হন আফজল খান ও শিবাজী বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী আফজলের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন শিবাজী। আফজল তার লুকানো ছোরা দিয়ে শিবাজীর পৃষ্ঠে আঘাত করলে তা লুকানো বর্মের আঘাতে ছিটকে যায়। তৎক্ষণাৎ শিবাজী তাঁর দক্ষিণহস্তে লুকানো তীক্ষ্ণ ‘বাঘ নখ’ বসিয়ে দেন আফজলের পেটে। আফজলের বিশ্বস্ত কৃষ্ণাজী কুলকার্ণী ও সৈয়দ বন্ডার যথারীতি শিবাজী ও বীর জীব্যামহাল্যার হাতে মৃত্যু ঘটে। আহত আফজল পালকিতে চেপে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বীর সম্ভাজী কাওলীর তীব্র আঘাতে তার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হয়। অপরদিকে গভীর জাওলীর অরণ্য মধ্যে হাজার হাজার মারাঠা যোদ্ধা বীর বিক্রমে প্রতাপগড়কে অবরোধ করে থাকা অসতর্ক আদিলশাহী ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাদশাহী সৈন্যদলের আর্তনাদ ও মারাঠাদের ‘হর হর মহাদেব’-এর গর্জনে জাওলীর অরণ্য ও সহ্যাদ্রি পর্বত কেঁপে ওঠে। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মারাঠা সৈন্যদল বিপুল আদিলশাহী বাহিনীকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করে। আফজলের দুইপুত্র বন্দী হলেও শিবাজীর বদান্যতায় তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রতাপগড়ের যুদ্ধে এই অবিস্মরণীয় বিজয়ের ফলে শিবাজীর যশোগাথা সমগ্র মহারাষ্ট্রে বিস্তৃত হয়। পরাক্রান্ত আদিলশাহী সাম্রাজ্যের এই শোচনীয় পরাজয় হিন্দু স্বরাজ্য ও ভবিষ্যতের মারাঠা সাম্রাজ্যের এক শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপনা করে। ১৭৭৮ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিচক্ষণ মন্ত্রী নানা ফড়নবীশ চক্রান্তকারী মন্ত্রী সখারাম বাপুকে প্রতাপগড়ে বন্দী রাখেন। ১৭৯৬ সালে গোয়ালিয়রের দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ষড়যন্ত্রে নানা ফড়নবীশ পুণা থেকে সরে এসে প্রতাপগড়ে আশ্রয় নেন এবং একটি শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত করেন। ১৮১৮ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের শান্তিচুক্তি অনুসারে প্রতাপগড় বৃটিশদের সমর্পণ করা হয়। ১৯৬০ সালে দুর্গের ভিতর একটি গেস্ট হাউস ও জাতীয় উদ্যান নির্মিত হয়। বর্তমানে প্রতাপগড় দুর্গ সাতারা রাজ্যের উত্তরসূরী উদয়রাজে ভোঁসলের মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। নৃশংস আফজল খানের বধ্যভূমি এবং বীর শিবাজী ও তার মারাঠা যোদ্ধাদের অভূতপূর্ব রণনৈপুণ্যের সাক্ষী অজেয় প্রতাপগড় অদ্যাপি হিন্দবী স্বরাজের যশোগাথার জয়ঘোষ গগন বিদীর্ণ করছে। □

গুরু গৈরিক পতাকা

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিটিকে 'গুরুপূর্ণিমা' বলে অভিহিত করা হয়। অন্য নাম ব্যাসপূর্ণিমা। ভারতবর্ষের জনজীবনে বিশেষত হিন্দু সমাজে এই তিথির মাহাত্ম্য অপরিসীম। স্মরণাতীত কাল থেকে গুরুপূর্ণিমার তিথিতে গুরুপূজা, গুরুবন্দনা আমাদের দেশে প্রচলিত। সুপ্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল অবধি ভারতবর্ষে গুরুর স্থান, ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আমাদের সাহিত্যে রয়েছে।

গুরু শব্দটির সাধারণ অর্থ দীক্ষাদাতা, শিক্ষক, আচার্য ইত্যাদি। সাধারণভাবে ব্যক্তিকেই গুরুপদে বরণ করা হয়। এই গুরু শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ, আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর বিষয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে শিক্ষা দান করেন। তাকে পথনির্দেশ করেন যাতে সে তার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে। তবে গুরু শুধুমাত্র সিলেবাসের পাঠটুকুই শিষ্যকে শেখান না। তাঁকে আর একটি ভূমিকা পালন করতে হয় সেটি হলো শিষ্যের মধ্যে সেই বিষয়ে বিশদে জানার আগ্রহ তৈরি করা যাতে মানবসমাজে কিছু অবদান রেখে যেতে পারে। ভারতবর্ষ কালে কালে এই ধরনের অবদানে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাধারণভাবে ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা বা গ্রহণ করার প্রচলন থাকলেও আমরা কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাই। এক্ষেত্রে প্রথম যেটি মনে আসে, তাহলো 'শিখপন্থ' অবলম্বনকারীগণের গুরু একটি পবিত্র পুস্তক যা 'গুরুগ্রন্থ সাহিব' নামে গৃহীত। দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ দ্বারা পবিত্র গ্রন্থসাহিব-কে গুরুস্থানে রাখা হয় এবং ব্যক্তিগুরুর পরিবর্তে ওই পবিত্র গ্রন্থটিকে গুরু বলে মান্যতা দেওয়া হয়।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক, অ-সরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস) কোনও ব্যক্তিকে গুরু রূপে গ্রহণ না করে ভগবা বা গৈরিক ধ্বজকে গুরু রূপে মান্যতা দিয়েছে। যা আগে উল্লেখ করা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের আর একটি সংযোজন। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে। এবিষয়ে সংঘ মোটামুটিভাবে দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে— প্রথমটি হলো ব্যক্তির নশ্বরতা। সৃষ্টির যাবতীয় যা কিছু 'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়' এই সূত্রে আবদ্ধ। তবুও ব্যক্তির জীবদ্দশার ব্যাপ্তি সংঘের লক্ষ্য পূর্তির জন্য যে সময় দরকার তার নিরিখে নিতান্তই স্বল্প। তাই আমরা যে গুরুকে পথপ্রদর্শক রূপে পেতে চাইছি তিনি তাঁর আয়ুষ্কালটুকুই পথে নির্দেশ করা জন্য উপস্থিত থাকতে পারবেন তার পরে নয়। দ্বিতীয়টি ব্যক্তির বিচ্যুতি। অভিজ্ঞতা বলে ব্যক্তির বিচ্যুতি তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। এই বিচ্যুতির জন্য তিনি তাঁর শিষ্য, অনুগামীদের কাছে নৈতিকভাবে গুরুপদে থাকার অধিকার হারান। কিন্তু অপর একটি বিষয়ে এক্ষেত্রে অবশ্য বিচার্য। যে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে গুরুপদে বরণ করা হয়েছিল, যে ব্যক্তিকে পুরুষোত্তম বলে বন্দনা করা হয়েছিল তাঁর বিচ্যুতির ফলে তার শিষ্য অনুরাগীদের মনে যে ব্যাথা, যন্ত্রণা হয় তার কোনও প্রতিকার নেই।

গৈরিক পতাকার উপরে আলোচিত দুটি সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। সুপ্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীতে যেগুলি হিন্দুত্বের পরিচয়বাহী আর অন্যতম গৈরিক। এই গৈরিক বস্ত্র, গৈরিক পতাকা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৈরিক পতাকার উপস্থিতি রামায়ণ মহাভারতের সময়কাল থেকেই। বিগত সহস্রাব্দে বিদেশী জাতিগুলির অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা সংগ্রামের নায়কদের অনেকেরই পতাকা ছিল গৈরিক। আজও গৈরিক পতাকা হিন্দুত্বের দ্যোতক এবং প্রেরণার উৎসমুখ। বর্তমানকালের অশান্তি, অ-সুখ, অনিশ্চয়তা ভরা জীবন-যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল (Last Resort) হিন্দুত্ব আর এই সব উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের আশ্বাস ও আশ্রয়দানকারীরা হলেন গেরুয়াবসন-ধারীগণ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে যা হলো একটি বিশিষ্ট জীবনচর্যা। সুতরাং হিন্দুত্বের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন এবং পৃথিবীর সমস্ত হিন্দুদের সংগঠিত করার যে ব্রত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক গ্রহণ করেছে তারপক্ষে গৈরিক পতাকাকে গুরু রূপে বরণ করা সুসংগত এবং স্বাভাবিক। অন্য আর একটি দিক থেকে গৈরিক পতাকাকে গুরু রূপে মান্যতা দেওয়ার যৌক্তিগতাকে দেখা যেতে পারে। সংঘ তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ঘোষিত ভাবে ধ্যেয়বাদী। আদর্শই তার সদস্যদের কাছে, প্রধান ব্যক্তি কখনওই নয়। তার লক্ষ্য পরমবৈভবশালী ভারতের পুনরুত্থান যে ভারত উঠবে শুধু নিজের জন্য নয় সমগ্র বিশ্বের জন্য আশার-ভরসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আগামী দিনের ভারতবর্ষ যাকে 'চির গৈরিকধারী' (কবি নজরুলের দেওয়া অভিধা) স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিব্য মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করে ঘোষণা করেছিলেন "...আমাদের এই প্রাচীনা ভারতমাতা পুনরায় একবার জাগ্রত হয়ে পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ সমুজ্জ্বল হয়ে নিজের রত্নসিংহাসনে আরূঢ়া হচ্ছেন।"

সেইদিনও গৈরিক পতাকা ভারতবর্ষের প্রতিভূ রূপে স্বমহিমায় বিরাজ করবে ভারতবাসীকে পথ প্রদর্শন করবে, এই দৃঢ় প্রত্যয় সংঘের সদস্যগণ পোষণ করে। ❑

ছোটোদের বড় ভাবনা

নবাঙ্কুর

ছোটোরাই বন্ধ করতে পারে বড়োদের কিছু খারাপ অভ্যেস

হাওড়া-কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে রবীন্দ্র-সেতু। সেতুর বয়স সত্তর বছর পেরিয়েছে। সেতুর উপর দিয়ে অনবরত চলছে মানুষ আর গাড়ি। আগে ট্রাম চলত। পরে প্রযুক্তিবিদরা বললেন, 'ট্রাম যাতায়াতে সেতুর ক্ষতি হচ্ছে!' সেতুর উপর দিয়ে ট্রামের চলা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া শহরে ট্রাম চলাচল বন্ধ হলো বরাবরের জন্যে। বলা হলো, সেতুর দুপ্রান্তে একমাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও টিউবওয়েল বসানো যাবে না। সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নলকূপ বসেছিল। এখন কড়াকড়ি বাড়ায় একইভাবে মাটির নিচের জল তোলা বন্ধ হয়েছে। সেতুর দুপ্রান্তে লেখা রয়েছে : 'এই সেতু কলকাতার গর্ব। একে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার।' যারা সেতু ব্যবহার করছে তাদের ওসব কথাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও গরজ নেই। সেতুর কিছু রেলিং কে বা কারা খুলে নিয়েছে। সেতুর উপর চলতি মানুষরা হরদম থুতু ফেলছে। বিশেষজ্ঞরা বললেন, 'খৈনি, পানমশলা জাতীয় জিনিস খাওয়ার অভ্যেস ক্রমশ বাড়ছে। তার ফলে থুতু ফেলাও চলেছে। তামাক চুন মেশানো থুতুতে সেতুর থামের ক্ষতি হচ্ছে।' কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না। এরকম চলতে থাকলে সেতুর থামের ক্ষতি হয়ে যাবে যথেষ্ট! সেতুর মূল হচ্ছে থাম। বিপদের আশঙ্কা করে থামগুলো কয়েকফুট ঢাকার ব্যবস্থা হচ্ছে ফাইবার গ্লাস দিয়ে। মাঝে মাঝে খুলে ধুয়ে নেওয়া যাবে। একদল দায়িত্বজ্ঞানহীন নাগরিকের বেপরোয়া আচরণকে রোখা সম্ভব না হওয়ায় সেতুর নিরাপত্তার প্রয়োজনে এসব পরিকল্পনা নিতে হয়েছে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে। পৃথিবীর কোনও উন্নত দেশের নাগরিকরা এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করে না।

সেতুর দুপ্রান্তে কিছুদিন ধরে আবেদন ঝুলছে : 'এই সেতুকে রক্ষা করুন ময়লা আর থুতু থেকে।' অনেকেই দেখছে। কোনওরকম গুরুত্ব না দিয়ে পানমশলা খৈনি খেতে খেতে আর থুতু ফেলতে ফেলতে চলেছে। সামনে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে।

ঠিক হলো অন্য পদ্ধতি। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়ে পরপর কদিন ইউনিফর্ম পরে বড়োদের বোঝাতে লাগল : 'থুতু ফেলবেন না সেতুর উপর। আপনার থুতুতে সেতুর ক্ষতি হবে।' নানাভাবে প্রচার চলতে থাকল। সহজে কি লোকের অভ্যেস বদলানো যায়! অনেক সময় লাগবে। হাল ছাড়লে চলবে না। নতুন সেতু বিদ্যাসাগর সেতুর উপর দিয়ে লোকের হাঁটাচলা প্রথম থেকেই বন্ধ। এর ফলে সেতুর উপর থুতু পড়ছে না। সেতু ঠিক থাকছে। হাওড়া সেতুর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না। থুতু ফেলা বেড়েই চলেছে।

কলকাতার চারপাশে নানা জায়গায় ওইভাবে থুতু ফেলার অভ্যেস আমরা দেখছি। প্রথমত, ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাস্থ্যকর। দ্বিতীয়ত, কাজটা রীতিমতো অপরিচ্ছন্ন। তৃতীয়ত, তামাক চুন মেশানো থুতুতে ক্ষতি হচ্ছে অনেক।

কয়েকজন বললেন, শুধু হাওড়া সেতুতে নয়, অন্য জায়গাতেও প্রচার চাই। আর এই অভ্যেসের বদল চাই দ্রুত। ঘরে বাইরে সকলকে এটাই শেখানো দরকার, কোনও সুনাগরিক ও দায়িত্ব-সচেতন মানুষ যেখানে-সেখানে থুতু ফেলে না। অন্যকে ফেলতে দেখলে চুপচাপ না দেখে বারণ করে।

কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

চকোলেট খেতে পারো, তবে যত খুশি নয়

চকোলেট খেলে সকলের মন ভরে যায়। সারাদিন অনেক কাজের চাপ গেছে। বড়োরা চকোলেট খেয়ে নিলেন। তাতে খিদে কমল, ক্লান্তি দূর হলো। তবে শুধু চকোলেট খেয়ে থাকাটা ঠিক নয়। কেউ কেউ বলেন, চকোলেটে ওজন বাড়ে। কিন্তু তা নয়, চকোলেট ওজন কমায়। খুব বেশি কোনও জিনিস খাওয়া ঠিক নয়। চকোলেট তো নয়ই। মাঝে মধ্যে নিয়ম মেনে খেলে শরীরে বল আসতে পারে। মনেও। পকেটে চকোলেট থাকলে একটু ভরসা পাওয়া যায়, খিদে তেষ্টা বাড়লে কাজে লাগবে। সারাদিন অন্য কিছু না খেয়ে শুধু চকোলেট খেয়ে গেলে ক্ষতি হবে। ছোটোদের অনেকেই উপহার দেন চকোলেট। বড়ো বড়ো চকোলেট ভাগ করে খাওয়ার অভ্যেস গড়ে উঠলে মন বড়ো হবে আর শরীরের ক্ষতি এড়ানো যাবে। **বার্তাবহ**

বিপুল স্যারের পরামর্শ

খাওয়ার আগে হাত-ধোওয়া

বাড়িতে আর স্কুলে খাওয়ার আগে হাত ধোওয়ার অভ্যেস সকলের থাকে না। হাতে অনেক ময়লা থাকে! হাত না ধুয়ে খেলে ময়লা খাবারের সঙ্গে পেটে যায়। তাতে শরীরের ক্ষতি হয়। অনেক রকম অসুখ-বিসুখ হতে পারে। বিপুল স্যার সবসময় বলেন, 'যখনই কিছু খাবে তার আগে হাত ধুয়ে নেবে। হাতে ময়লা থাকে। তাতে লুকিয়ে থাকে এমন কিছু জিনিস যা শরীরের ক্ষতি করে। খালি চোখে দেখা না গেলেও সেগুলোর ক্ষমতা খুব বেশি। ছোটোদের খুব ক্ষতি হয় তাতে।' হাত ধোওয়ার অভ্যেস একবার গড়ে উঠলে দেখা যাবে, হাত না ধুয়ে খাওয়ার ইচ্ছেই হবে না কোনও সময়ে। সবরকম সুঅভ্যাসের মধ্যে থাকার ইচ্ছে জাগলে তা ছাড়া সম্ভব হবে না। শরীর মন ভালো থাকবে। তাতে পড়াশোনা ভালো হবে। অনেক কাজে উৎসাহ থাকবে। হঠাৎ শরীর কাবু হবে না। এগিয়ে চলার জন্যে, বাঁচার জন্যে শরীর তাজা রাখতে হবে। পরিষ্কার হাতে খেলে শরীরের সমস্যা পালাবে। আর একজনের দেখাদেখি অন্যরাও অভ্যস্ত হবে হাত ধোওয়ায়।

স্কুলে নোটিশ দেওয়া হলো 'হাত না ধুয়ে কেউ কিছু খাবে না।' প্রথম প্রথম ব্যাপারটা একটু কঠিন শাস্তি মনে হলো কারও কারও। কেউ কেউ বললেন, 'খারাপ অভ্যেস আয়ত্ত করা সহজ। ছাড়া কঠিন। ভালো অভ্যেস রপ্ত করা কঠিন। ধৈর্য নিষ্ঠা জেদ থাকলে সবকিছুই সম্ভব।'

বিপুল স্যার বললেন 'আমরা সবাই নিরক্ষর ছিলাম। একটু একটু করে লেখাপড়া শিখেছি। কষ্ট করেই সবকিছু শিখতে হয়। তোমরা হাত ধুয়ে খেতে শিখলে সারাজীবন তা বজায় থাকবে।' বিপুল স্যারের কথা সকলে মানবে— সিদ্ধান্ত নিল। তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বই আনবেন ঠিক করলেন।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ভারতে পোস্টকার্ড প্রচলন হয় কবে?

২. কোন্ বিখ্যাত বাঙালি ডাক্তারের জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে?

৩. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কবে?

৪. ভারতে প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা কবে? প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫. রবীন্দ্রনাথের জামাতা, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা?

উত্তর : ১. ১ জুলাই ১৮৭৯। ২. ডা. বিধানচন্দ্র রায়। ১ জুলাই ১৮৮২। ১ জুলাই ১৯৬২। ৩. ৬ জুলাই ১৯০১। ৪. ১৯১৬। আর জি কর (রাধাগোবিন্দ কর)। ৫. প্রমথনাথ চৌধুরী। সবুজপত্র।

ছোটোদের বলছি

তোমাদের লেখা আঁকা
পাঠিয়ে দাও
নবাঙ্কুর-এ।
নাম ঠিকানা বয়স
স্কুলের নাম লিখতে
ভুলো না।
সম্পাদক 'স্বস্তিকা'

উলটো পালটা

কমল দেবনাথের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন নারায়ণ ঘোষ।

নারায়ণ বললেন : 'আপনার ছেলে অনেকক্ষণ ধরে খাটে ডিগবাজি খাচ্ছিল। থামতে চাইছিল না। খুব উৎসাহ আর দম।'

কমল বললেন : 'ওই কাজটা ভালোই পারে।'

নারায়ণ বললেন : 'ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।'

কমল বললেন : 'এর মধ্যে ভবিষ্যৎ বোঝা যায়?'

নারায়ণ বললেন : 'ডিগবাজি খাওয়ার অভ্যেস ভালো হলে বড় হয়ে অনেক বড় রাজনৈতিক নেতা হতে পারবে।'

২.

স্বামী স্ত্রী বেরোচ্ছেন এক আশ্রমে যাবেন বলে। স্ত্রী খুব সেন্ট মাখলেন। স্বামী বললেন, 'যাবে তো সাধু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। অত সেন্ট মাখার কি আছে?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'এখনকার সাধুমহারাজরা ভালো গন্ধ না পেলে ঠিকমতো কথাবার্তা বলেন না।'

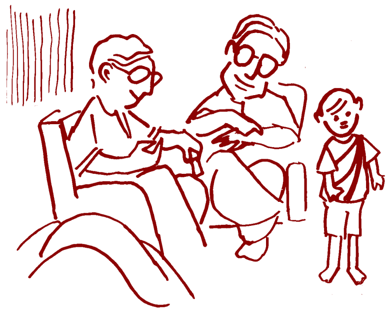

৩.

শ্রাবণীকে স্কুলের দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন : 'ভাগ শিখেছো তো?'

খুশিতে মাথা হেলিয়ে শ্রাবণী বলল : 'হ্যাঁ দিদি।'

দিদিমণি বললেন : 'তোমাকে নটা পেনসিল তিনজনের মধ্যে ভাগ করতে দেওয়া হলো। কে কটা পাবে?'

শ্রাবণী বলল : 'আমি পারবো না। শুধু লজেন্স আর চকোলেট আমি ভাগ করতে পারি।'

রামগরুড় সংকলিত

চিরন্তনী মা

বিদিশা ভট্টাচার্য

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'

কাঠফাটা রোদ্দুর, কোথাও একটু ছায়া নেই। কোলের ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে রাস্তার একধারে। রোদ আড়াল করতে তার মাথায় একটা ছেঁড়া ছাতা ধরে আছে। যখনই ছেলেটি ভয়ে কেঁদে ওঠে তখনই ভালবাসার বাহুডোরে আগলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নেয়। তিনি আর কেউ নন। খুব মধুর সেই শব্দ 'মা'। যার হয় না কোনও সংজ্ঞা, হয় না কোনও বিশ্লেষণ। শুধুই শব্দটির উচ্চারণের মধ্যে রয়েছে মধুর শান্তি।

ফেব্রুয়ারিতে ভ্যালেন্টাইন্স ডে, মার্চে উইমেনস ডে-র পর প্রত্যেক বছরে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে মাদারস ডে পালনের পালা আসে। পৃথিবীর সব দেশে অবশ্যই একই দিনে মাদারস ডে পালিত হয় না। তবে আমেরিকাতে হয় বলে তার দেখাদেখি বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই ওই দিনটিতে 'মাদারস ডে' সেলিব্রেট করা হয়। মায়ের থেকে এ বিশ্বে বড় আর কেউ নয়। আমরা সবাই বড় হই মায়ের বুকভরা স্নেহ, পরম আদর আর গভীর ভালবাসায়। প্রত্যেক মানুষের বড় হওয়ার পিছনে থাকে মায়ের সঠিক পথনির্দেশের ইশারা। ছোট্ট সেই বাচ্চা যখন সত্যিই বড় হয়, তখন মা-ই সবথেকে বেশি খুশি হন। শিশুটি যখন বড় হয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মায়ের চোখে মুখে ফুটে ওঠে সাতরঙা রামধনু। পরিতৃপ্তি, প্রশান্তি।

এমন আলোচনা করা যাক কিছু রত্নগর্ভা মায়েদের নিয়ে। বিদ্যাসাগরের দয়াবতী জননী ভগবতী সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায় কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনও প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না।' আর রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী রত্নগর্ভা। সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী শুধু নেতাজীর মা ছিলেন না, সারা ভারতবাসীর মা। জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দেবীই তো ছেলের মধ্যে সাহিত্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সাহিত্যবোধ গড়ে তুলেছিলেন। ছাত্রী হিসাবেও ছিলেন খুবই মেধাবী। নব্যযুগের প্রাণপুরুষ বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছেই তো শুনেছিলেন মনীষী জীবনের রকমারি কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প আর পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা। অবনীন্দ্রনাথের মা সৌদামিনী ছিলেন প্রকৃতই মহীয়সী। মায়ের ভূমিকা ছেলের জীবনে ছিল গভীর ও ব্যাপক। বিভূতিভূষণের মা মৃণালিনী দেবী তো করুণার প্রতিমূর্তি। মায়ের সান্নিধ্যে বিভূতিভূষণের

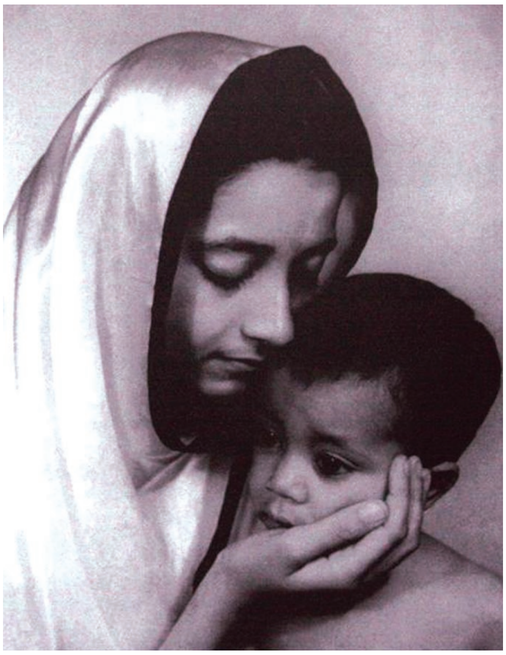

সোনারপুর হরিনাভির দিনগুলি বেশ আনন্দই কেটেছে। ঠাকুর পরিবারের পর আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত রায়চৌধুরি পরিবার। উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারের রক্ত যাঁর শিরায় প্রভাব যাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা রায়ের প্রেরণা ও ভূমিকা ছেলের জীবনে ছিল তুলনারহিত। সুপ্রভা দেবীর গান রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ছাত্রী হিসাবেও তিনি ছিলেন খুব মেধাবী ও কৃতী।

মাদারস ডে' বহুকাল ধরেই আছে আর এই দিনে মনে করবার মতো মাতৃত্বের সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোও চিরকালই ছিল। তবে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত জনজীবন ও কমার্সিয়ালাইজেশনটা হয়তো বা বছর ১৫-২০ পুরোনো। আমেরিকায় অবশ্য একশো বছর আগেই মাদারস ডে' নিয়ে বাণিজ্য করার বিকৃত রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এই দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠা আনা জার্ভিস। সিংহভাগ মধ্যবিত্ত গৃহবধূ মায়েরা স্বামী, সন্তান, শাশুড়ির মাঝে পারিবারিক শান্তিটুকু বাদে নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের খোঁজই নেননি কখনও। ব্যস্ত জীবনের দৈনিক কর্তব্য ও দায়িত্বগুলো ঠিক ঠিক পালন করতে করতে জানতেও পারেননি কখন 'মাদারস ডে' এসে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে। সেই মাদারস ডের প্রথম দিকে অনেকটাই ছিল অচেনা, আদায়কারী বিদেশী হুজুগ। কয়েক বছরের পরিচয় সেটাই কিন্তু মধ্যবিত্ত মায়েদের শেখালো যে আত্মত্যাগের কথা না ভেবে মাতৃত্বকে গর্বের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গেও অবশ্যই আত্মসচেতনার সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে। এখন আর মধ্যবিত্ত মাতৃত্ব মানে বদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে গরম ধোঁয়া নয়। পরিবারের সবার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, সবার জন্য চিন্তা করে নিজের খাবার শেষে রাখা নয়, অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে মাতৃত্বের গুরুদায়িত্বকে সারা বছর আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়ে তা পালন করে মাদারস ডে'তে নিজেকে সেলিব্রেট করার দিন। মাতৃত্ব নিয়ে গর্ব করার দিন।

'মায়ের কোনও জাত নেই'— কথাটা কাজে ও ব্যবহারে সব সমাজে সেদিন করে দেখানো হবে যেদিন 'মাদারস ডে' তার আপাত কমার্সিয়ালাইজড ইমেজ মুক্ত হয়ে সার্থক রূপ পাবে। মাতৃরূপে পূজা বা অনাদর অবহেলা কোনওটাই চাই না আমরা।

'আমার জন্য সইলে তুমি কতই ব্যথা / বুঝিয়ে দিলে মা হওয়া নয় মুখের কথা।'

সত্যিই সন্তান হওয়া কোনও বড় ব্যাপার নয় কিন্তু মা হওয়া সত্যিই গর্বের ও আনন্দের। আর সেই মা-এর কোলে ঘুমপাড়ানি গান, ভালোবাসার হাতে কোমল স্পর্শের ছোঁয়া, হাত ধরে হাঁটতে শেখা, প্রথম বুলিতে মা বলা সবই তার জন্য।

'মা' রা জীবন পথে সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। তবুও কেন বৃদ্ধাশ্রম? সেই উত্তর-এর সম্মুখীন হতে সব সন্তানই আজ বিহ্বল। তারা পারে কী করে? যার হাত ধরে বড়ো হওয়া তাঁকেই আবার হাত ছেড়ে দূরে সরিয়ে দিতে, এও সম্ভব? হয়তো দামী অর্থমূল্যের উপহার তাঁরা চান না। শুধু চান সন্তানের থেকে একটু ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আমার এই অক্ষরমালা হয়তো কিছুই নয়, পৃথিবীর সমস্ত মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য মাত্র। □

এই সৈয়দ সেই সৈয়দ নন

শিবাজী গুপ্ত

কিছুদিন আগে এক ইসলাম-প্রেমান্ধ সংবাদপত্রে ‘‘আলিগড়ের নামে কেন বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়’’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ এবং ‘‘উল্টাদিকে যাত্রা’’ শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে মনে হয়েছিল— ‘‘এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?’’ আজকাল (পত্রিকা নয়) সত্য কথা বলার সৎ সাহস মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। তার উপর অপ্রিয় সত্য কথা বলার মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তো নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমও পিছিয়ে নেই। এই পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদের আম্রকাননে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলম পোঁতার ‘ইটকারি’ সিদ্ধান্তের যে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে, তা এককথায় অনবদ্য এবং পত্রিকার ঐতিহ্য বিরোধী।

দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সূতিকাগার বলে কুখ্যাত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ জীবনের একটা পর্যায়ে ছিলেন খাঁটি জাতীয়তাবাদী, হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত। নিজেকে তিনি হিন্দু বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেননি। ১৮৮৪ সালে লাহোরের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এক সংবর্ধনা সভায় তাঁকে মুসলমান নেতা বলে অভিহিত করলে তিনি অনুযোগ করে বলেছিলেন :

"In my opinion, the concept of nation is not to be linked with one's religious belief... The term Hindu should not be identified with the Hindu Community alone. All sections, whether they be Mussalman or Christian-- are Hindu. I am, therefore sorry that while you have used the word Hindu for yourselves, you have not called me by that name."

শুধু কি তাই? হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চিরস্থায়ী প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের স্বার্থে

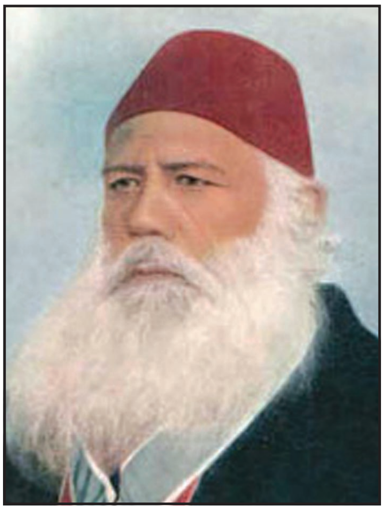

স্যার সৈয়দ মুসলমানদের গো-কোরবানি বন্ধ করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। এই দেশের হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মাবলম্বী মিলেই যে এক ভারতীয় জাতি, সেকথা শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্যার সৈয়দ গুরুদাসপুরে এক ভাষণদানকালে ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন :

"Hindu and Muhammadan brethren ! Do you people have any country other than Hindusthan ? Remember, that the words 'Hindus' and 'Muhammadans' are only meant for religious dislinctions; otherwise all persons whether Hindu, Muhammadan or Christian, who reside in this country belong to one and the same nation...They must each and all unite for the good of the country which is common to all."

কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! মাত্র চার বছরের মধ্যে স্যার সৈয়দের এই উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদের আলখাল্লা খসে পড়ল। ১৮৮৮ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে তিনি সরাসরি দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তারূপে আবির্ভূত হলেন :

“I do not understand what the words " National Congress" mean. It it supposed that the different castes and creeds living in India belong to one nation or can become a nation and their name and aspirations be one and same? I object to every Congress in any shape or from whatever, which regards India as one nation."

সুতরাং পবিত্র কোরানে মানবজাতিকে যে ‘বিশ্বাসী মুমিন’ ও ‘অবিশ্বাসী কাফের’ নামে দুই জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে, স্যার সৈয়দ তাকেই দ্বিজাতিতত্ত্ব রূপে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বৃটিশ সরকার সেই সূত্র ধরেই ‘Two-Nation’ নীতি প্রবর্তন করে দেশভাগের পথ প্রশস্ত করে গেছে। পরবর্তীকালে ঘোর জাতীয়তাবাদী মিঃ জিন্নার কট্টর সাম্প্রদায়িক জিন্নায় পরিণত হবার সঙ্গেই স্যার সৈয়দের এই নৈতিক ডিগবাজির তুলনা চলে। ভোটবাজ নেতানেত্রীরা মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক বিষাক্রান্ত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শাখা স্থাপন করেছেন, তা কালে কালে মহীরুহ হয়ে দাঁড়াবে একথা নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই বিষফলের মুকুল বেরোতে শুরু করেছে!

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ‘‘চিঠিপত্র’’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

বন্ধুত্বের জন্য ‘পূর্ব দিকে তাকাও’ নীতি

অতিথি কলম

জি পার্থসারথি

চীনের ভারত-নীতির অনেকগুলি স্তর আছে যার মধ্যে একটি স্তরে চীন ভারতকে এক উদীয়মান শক্তি হিসেবে স্বীকার করে এবং সেই হিসেবে ভারতকে কোনওমতেই অবহেলা করতে চায় না। উপরন্তু BRICS এবং G 20 প্রভৃতি ফোরামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতের এই সব ফোরামে উপস্থিতির জন্য ভারতের একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি আছে বলে মনে করা হয়। আবার এই ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক গাঢ়তর হচ্ছে। ভারতের এই বলিষ্ঠ নীতির জন্য তাকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়। বিশেষত যখন ভারত স্পেস ও মিসাইল শক্তি প্রদর্শন করে বা সীমান্তবর্তী মিডল কিংডমের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে চায়। যাইহোক, চীন যেমন ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ রাখতে চায় তেমনি সে ভারতকে চাপেও রাখতে চায়। এটাও তার একটা নীতি। এই নীতির লক্ষ্যে সে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার ও মিসাইল ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে এবং পাকিস্তানের পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ও উত্তর এলাকার উপর দখল মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে ভারত যখন তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী--- শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বিশেষত নেপালের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চায় তখনই চীনের যত আপত্তি।

এই চাপে রাখার নীতির জন্য চীন আমাদের ‘পূর্ব দিকে তাকাও’ নীতিতে বাধা দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক ফোরাম যেমন নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপে থাকার ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি করছে, রাষ্ট্র সঙ্ঘ কর্তৃক পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যেমন জামাত-উদ-দাওয়া-কে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণার বিরোধিতা করে। উপরন্তু, চীন সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সমান হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে মদত দিচ্ছে। দুই যুগের বেশী সময় ধরে ভারত চীনের বিষয়ে ভুল নীতি গ্রহণ করেছে। যতই চীন আর্থিক তথা সামরিক দিক দিয়ে শক্তিমান হচ্ছে ততই সে প্রতিবেশীদের উপর নানা দিকে বিশেষত স্থল ও সামুদ্রিক সীমানা নিয়ে প্রভুত্ব দেখাচ্ছে। পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সমুদ্রের প্রতিবেশী দেশগুলিকে ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে চীনের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা ও দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছে।

চীন এখন দাবী করছে যে গোটা দক্ষিণ চীনা সমুদ্র অঞ্চলে তার অধিকার এবং সেটি দেখানোর জন্যে প্রায়শই ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন্সের সঙ্গে সংঘাত বাধাচ্ছে। এর ফল কি হয়েছে? চীনের প্রতিবেশীরা এখন পশ্চিম এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মার্কিন উপস্থিতির আবেদন করেছে। ওয়াশিংটন ডি সি তাদের অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে মেনে ফিলিপাইন্স, জাপান এমনকি ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশকে নিয়ে প্যাসিফিক ফ্লিটের মহড়া

> ‘পূর্ব দিকে তাকাও’ নীতির জন্য অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা অপরিহার্য তেমনি চীনের সীমান্ত এলাকায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি একান্ত দরকার। চীনারা ভীষণ বাস্তববাদী। ওরা বলপ্রয়োগের ‘লজিক’ বোঝে। এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে চীন ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নেবে এবং এক সময়ে গোটা অরুণাচল প্রদেশের উপর তার দাবি ছেড়ে দেবে।

দিতে শুরু করেছে। কেন দক্ষিণ চীনা সমুদ্রে চীন এত আগ্রহ দেখাচ্ছে? কারণটা হলো— এই এলাকায় ১৭ পয়েন্ট ৭ বিলিয়ন অশোধিত তেলের সমান তেল ও গাসের সঞ্চয় আছে। ভারত যখন ভিয়েতনামের সঙ্গে তেল সংগ্রহের প্রকল্পে হাত মিলিয়েছিল তখন চীন ভারতকে সাবধান করেছিল এবং একটি ভারতীয় সামুদ্রিক জাহাজকে দক্ষিণ চীনা সমুদ্রে প্রবেশে বাধা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ভারত ও ভিয়েতনাম এই মর্মে যৌথ বিবৃতি দিয়েছিল যে, 'পূর্ব ও দক্ষিণ সমুদ্র সম্পর্কিত বিবাদ শান্তিপূর্ণ ভাবে সর্বসম্মত গৃহীত নীতি অনুসরণ করে মিটিয়ে ফেলতে হবে এবং এই ব্যাপারে ১৯৮২ সালের ইউ এন কনভেনশন অফ দি ল' অফ দি সি এবং দক্ষিণ চীনা সমুদ্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে ২০০২ সালের ASEAN চীনা ডিক্লারেশন মেনে চলতে হবে।'

দক্ষিণ চীনা সমুদ্র অঞ্চল সম্বন্ধে ভারতের এই নীতি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলতে হবে। নভেম্বর ২০১১ সালে বালিতে পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে চীন কোণঠাসা হয়েছিল। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা করেছিলেন যে দক্ষিণ ও পূর্ব চীনা সমুদ্র বিষয়টি ওই শীর্ষ সম্মেলনে উঠবে না। কিন্তু ১৮টি অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে মায়নামার ও কাম্বোডিয়া ছাড়া সবাই প্রশ্ন তুলেছিল। সিঙ্গাপুরও প্রশ্ন তুলেছিল, কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে। মনে রাখতে হবে সিঙ্গাপুর ASEAN দেশগুলির মধ্যে একটি বড়সড় ভূমিকা নিয়েছে। যাইহোক শীর্ষ সম্মেলনে ASEAN দেশগুলির সমবেত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে চীনের গ্লোবাল টাইমস-এর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও। হুঁশিয়ারিটি ছিল : যে দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দাবা খেলার অংশীদার হবে তাদের চীনা অর্থ সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হবে। মোদ্দা কথা হলো, চীন প্রতিবেশীদেশগুলির সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও-এর ভিয়েতনামের সমুদ্রতীরে তেল অনুসন্ধান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন, দক্ষিণ চীনা সমুদ্রে ভারতের স্বার্থ শুধুমাত্র বাণিজ্যিক এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আইন ও আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

ভারতের সঙ্গে জাপানের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক মিডল কিংডমের নজর এড়ায়নি। জাপান এখন নিঃসন্দেহে ভারতের অর্থনৈতিক অংশীদার। এই দেশ ভারতে রেল ও শিল্প তৈরিতে সাহায্য করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো প্রকল্পগুলি শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে। এর জন্য দায়ী আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রকল্প নিয়ামকেরা। কেন জাপান ভারতের দিকে ঝুঁকেছে?

এর কারণ হলো জাপান অনেকদিন ধরে— বিশেষত বিগত দুই বছর ধরে— চীনের কাছ থেকে পূর্ব চীন সমুদ্রে অবস্থিত সেনাকাকু দ্বীপ বিষয়ে খুব বাধা পেয়েছে। ভারতকে বন্ধু করে জাপান ভারতের সঙ্গে এশিয়াতে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। এবং সেই লক্ষে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সামরিক মহড়া শুরু করেছে। পরে আমেরিকা এতে যোগ দেওয়ায় বিষয়টি ত্রিপাক্ষিক সামরিক মহড়ায় পরিণত হয়েছে। এই মহড়া চলেছে ওকিনাওয়াতে। কিন্তু ভারত এখনও যেমন দরকার তেমনি সক্রিয় ভাবে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন্স প্রভৃতি ASEAN দেশগুলির পাশে দাঁড়াতে পারেনি। ভারত যদি ইন্ডিয়ান ব্রহ্মস ক্রুইস মিসাইল সরবরাহ করত, তবে এই সব দেশগুলির নৌ এবং সমুদ্রতট প্রতিরক্ষাশক্তি বৃদ্ধি পেত। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে ভারত এখনও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করছে।

যেমন 'পূর্ব দিকে তাকাও' নীতির জন্য অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা অপরিহার্য তেমনি চীনের সীমান্ত এলাকায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি একান্ত দরকার। চীনারা ভীষণ বাস্তববাদী। ওরা বলপ্রয়োগের 'লজিক' বোঝে। এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে চীন ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নেবে এবং এক সময়ে গোটা অরুণাচল প্রদেশের উপর তার দাবি ছেড়ে দেবে। আবার এও মনে রাখতে হবে যে চীন ভারতের সঙ্গে সহজে সামরিক সংঘাতে যাবে না যদি সে দেখে ভারত সামরিক দিক দিয়ে প্রস্তুত, কূটনৈতিক বিষয়ে তৎপর এবং তার অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত। চীন ভারতকে আটকানোর নীতি অব্যাহত রাখবে, কিন্তু তবু এই বিষয়টির মোকাবিলা করা যাবে যদি আমরা সহযোগিতার মানসিকতা বজায় রাখি। এবং অন্যদিকে আমাদের প্রতিরক্ষা জোরদার করি ও আমাদের 'পূর্ব দিকে তাকাও' নীতিটা মাথায় রাখি।

(লেখক বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ও স্তম্ভলেখক)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সবুজ অর্থনীতি ও ভারতবর্ষ

বাসুদেব পাল

১৯৯২ সালে লাতিন আমেরিকার ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনারোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'বসুন্ধরা সম্মেলন'। উন্নত দেশগুলো ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল পৃথিবীকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কমে। একবিংশ শতাব্দীতে এমন এক উন্নয়ন-এর মডেল গ্রহণ করা যার ফলে বিশ্ব প্রকৃতি দূষণ থেকে বাঁচে, মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পায়। উন্নয়ন স্থায়ী হয়।

সবুজ কেবলই একটি রং মাত্র নয়। এটি জীবন-পদ্ধতি। সবুজ হলো আত্মসম্মান এবং ভারসাম্য রক্ষার প্রতীক। সবুজ প্রাকৃতিক উর্বরতা এবং জীবনের প্রতীক। আমাদেরকে সবুজের প্রতি সংবদ্ধ হয়ে বৃক্ষাদি সংরক্ষণ করে আমাদের পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০১২-তে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে--- ''সবুজ অর্থনীতি : আপনি কি এর অন্তর্গত?'' থিম হলো আমরা এমন কিছু করি যা সকলকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চালিত করবে। সবচেয়ে কার্যকর বিষয় হলো, ব্যক্তি মানুষ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সফলতার জন্য ব্যক্তি, সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, নাগরিক সমাজ, নিজ বসবাসের এলাকা সহ প্রত্যেকেই সংযুক্ত।

১৯৭২ সালের হিসাব ধরলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-কর্মসূচীর এটা চল্লিশতম বছর (United Nation's Enviornment Programme) হচ্ছে। এই বিশেষ বছরে পরিবেশ এবং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আরও একবার সেই ব্রাজিলের রিওডি জেনারোতে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে একত্রিত হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালের 'বসুন্ধরা সম্মেলনে'র কুড়ি বছর বাদে। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই হলো— স্থায়ী উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূর করতে 'এক সবুজ অর্থনীতি।' সেখানে বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষ থেকে একবিংশ শতাব্দীতে আরও একবার একবিংশ শতাব্দীতে ভবিষ্যৎ স্থায়ী উন্নয়নের পথ খোঁজা হবে।

সবুজ অর্থনীতি আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক স্পর্শ করছে উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে। সবুজ অর্থনীতি স্থিতিশীল উন্নয়ন, কম পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির উপযোগ, কর্মপ্রদানকারী, সম পরিমাণ কার্বন সৃষ্টিকারী, বন-শিল্প-কৃষির উন্নয়নের সহযোগী, পর্যটন উদ্যোগকে স্থায়ী স্বরূপ প্রদান করে, বর্জ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনের উপাদানকে বৃদ্ধি করে। সবুজ অর্থনীতির সঠিক উপযোগ অনেক সুফল প্রদান করে। ২০১২ সালকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ

রিও-তে প্রধানমন্ত্রী।

তাবৎ দেশের মানব সমাজ এবং আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, সকলেরই স্বচ্ছ বায়ু এবং নিরাপদ পরিবেশ-এর অধিকার জন্মগত। এই অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই ক্ষীণ। তবুও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংবিধানে ১২০টি দেশকে পরিবেশ-দূষণ রোধে বিধিনিষেধ আরও কঠিন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক দেশই সুস্থ পরিবেশের অধিকারকে ব্যক্তিগত অধিকার এবং স্বচ্ছ, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এর অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করছে। এই অধিকারের সঙ্গে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য, সততা এবং পার্থিব প্রকৃতির উপভোগও সংযুক্ত।

এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভারত কিন্তু তার নাগরিকদের পরিবেশগত সুযোগসুবিধা দিতে পারেনি। ভারতের বিচারবিভাগ কিন্তু অত্যন্ত বিস্তারিত পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানগত ভাবে পরিবেশের অধিকার প্রদানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছে যার ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়। পরিবেশ আইনেই বায়ুদূষণ প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। বনাঞ্চলে পরিপূর্ণ মধ্যপ্রদেশে সরকারিভাবে ইকো-ট্যুরিজমকে অভিযানমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি রাজ্য আবার ওই একই দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যটন নীতিতেই পরিবেশকে সবুজ করার নীতি গ্রহণ করেছে।

ভারতবর্ষের ও এন জি সি (Oil and Natural Gas Commission) অসমের শিবসাগর জেলার নাজিরাতে অহোম সংস্কৃতির বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— রং ঘর, কারেঙ্গ ঘর, তলাতল ঘর, নাজিরার বরবরা ট্যাঙ্কের সৌন্দর্যায়নও রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে যেকোনও সদর্থক পদক্ষেপই সবুজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাগতযোগ্য। আমরা আবহাওয়া পরিবর্তনের বিপরীত দিকটা নিয়ে বেশি চিন্তিত। পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমশ কমছে। আমরা এজন্য অন্যকে দোষারোপ করছি। অথচ সরকার পরিবেশ-নীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে না। কর্পোরেট সংস্থাগুলি প্রচুর পরিমাণে গ্রীণহাউস গ্যাস

এবছরের ২০-২২ জুন, রিও ডি জেনারোতে আয়োজিত জাতিসঙ্ঘের কনফারেন্সে রিও-২০ সমাবেশের মহাসচিব শা জুকাং, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন, ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ডিলমা রাউসেফ এবং মহম্মদ শাবান।

'সকলের জন্য স্থায়ী শক্তিবর্ষ'— হিসেবে অন্তর্জাতিক স্তরে পালন করছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এবছর আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে অফিসিয়াল স্লোগানই হলো— "সবুজ অর্থনীতি— আপনিও কি সংযুক্ত?"

২০১১ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রকাশিত 'মানব উন্নয়ন সূচক' শীর্ষকে বলা হয়েছে, সারা পৃথিবীর রক্ষা, ডিজেলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার আবশ্যক করা দরকার।

ভারতে বড় বড় কলকারখানা সবুজ অর্থনীতি, সবুজ বিশ্ব গড়ার দিকে পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিগত কয়েক দশক যাবৎ পরিবেশ অনুসারী পর্যটন সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। এতে পরিবেশ এর সুরক্ষা এবং জনকল্যাণ— দুটোই নির্গমন করছে। এন জি ও-গুলোও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। এবছর পরিবেশ সুরক্ষার জন্য আসুন আমরা সবাই মিলে সব বৈপরীত্য, মতানৈক্যকে দূরে সরিয়ে রেখে এই বসুন্ধরাকে অনাগত আগামী প্রজন্মগুলোর জন্য পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করে বাসযোগ্য করে তুলি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা।

অসমে জয়জয়কার বিদ্যাভারতীর

বাসুদেব পাল ॥ অসমে গতবারের মতো এবারও সংবাদের শিরোনামে উঠে এল বিদ্যাভারতী। কারণ বিদ্যাভারতী পরিচালিত হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১২-তে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (HSLC) উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ফল করেছে। এইচ এস এল সি পশ্চিমবঙ্গে একাদশ-দ্বাদশ-কোর্সের সমতুল। বিদ্যাভারতী পরিচালিত গুয়াহাটির বোকাকহাট-এর শংকরদেব বিদ্যানিকেতন এর ছাত্র জ্ঞানদীপ শর্মা এবং বিশ্বনাথ চারিয়ালির শংকরদেব শিশু বিদ্যানিকেতন-এর ছাত্রী স্তুতি খোণ্ড যৌথভাবে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ২০১১ সালেও এই একই পরীক্ষায় বিদ্যাভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরাই ছিল প্রথম কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন।

ফলে সংবাদমাধ্যমও ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সাক্ষাৎকার সহ উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০১২-তে সংখ্যাটা পাঁচ থেকে বেড়ে এগারো হয়েছে। অসমের সবক'টি জেলাতেই বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয় চলছে। দিন দিন স্কুলের সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। অভিভাবকদের বিশ্বাস ও আস্থার কেন্দ্র হচ্ছে বিদ্যাভারতী। ইংরেজীমাধ্যম বিদ্যালয়েই ভালো উচ্চমানের শিক্ষাদান বা পড়াশোনা হয়— এই প্রবাদ এবার ভেঙে দিল বিদ্যাভারতী। ইংরেজী মাধ্যম মিশনারী স্কুলে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়। অভিভাবকরাও সেখানে ছেলেমেয়েদের ভর্তির জন্য লালায়িত থাকতেন। কেননা ওই সব স্কুলের ঠাট-বাট ও পরিকাঠামো বেশ বড়। সেই তুলনায় শংকরদেব বিদ্যানিকেতন বা শিশুনিকেতন এর পরিকাঠামো অনেক ছোট। তবে ওখানে শিক্ষকদের ধৈর্য, পরিশ্রম এবং আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ের অনুশাসন, পরিবেশ, পঠন-পাঠন দেশে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গুরুকুলের সমান।

রাজ্য-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এই বিশাল শিক্ষা আন্দোলন ভারতজুড়ে চলছে। দেশজুড়ে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমেই বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

যৌথভাবে প্রথম স্থানাধিকারী দুজন বাদে অন্যদের নাম— মানসী বড়ুয়া, মৃদুপবন ডেকা, সুস্মিতা পাল, পরাগজ্যোতি বরা, কমলিনী কলিতা, ভাস্করজ্যোতি দাস, ভাস্বতী বরা, প্রণয় শর্মা এবং জুঁই ঠাকুরিয়া। অসমীয়া, ইংরেজী, বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজবিজ্ঞান এবং ঐচ্ছিক অঙ্কে ওরা সবাই লেটার মার্কস (৮০ শতাংশ) পেয়েছে। রঙ্গিয়া স্কুলের দু'জন যথাক্রমে ষষ্ঠ ও নবম স্থান অধিকার করেছে।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা ভাউরাও দেওরসের অনুপ্রেরণায় অন্যতম প্রবীণ প্রচারক কৃষ্ণচন্দ্র গান্ধীর (উভয়েই বর্তমানে স্বর্গগত) উদ্যোগে গোরক্ষপুরে ১৯৫২ সালে বিদ্যাভারতীর প্রথম বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল। বর্তমানে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রায় তিরিশ হাজার বিদ্যালয় চলছে। সব মিলিয়ে ফলাফল ভালো হওয়াতে বিদ্যাভারতীর জনপ্রিয়তা অন্যদের ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে— অসম তার অন্যতম উদাহরণ ও পথপ্রদর্শক।

মহিলা কুস্তির আখড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বক্সিং জিনিসটার মধ্যে একটা মার-কাটারি ব্যাপার যে রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। অন্ততঃ সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিরিখে বক্সিং যে কুস্তির চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে রয়েছে, এও অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে বক্সিং-এর চেয়ে কুস্তির প্রাচীনতা ঢের ঢের বেশি। ভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে উদ্ধৃত মল্লযুদ্ধের আধুনিক ফর্ম্যাট-ই যে কুস্তি, তা ইতিহাসবিদগণ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেইদিক দিয়ে দেখলে কুস্তির কৌলীন্যের ধারেকাছে পৌঁছোনরও ক্ষমতা নেই বক্সিংয়ের।

এহেন ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্রীড়াটির মর্যাদা এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা কতটা রক্ষা করতে পারছি তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রমী নাম চাঁদগী রাম আখড়া। পুরোনো দিল্লীর কাশ্মীরি গেট থেকে আখড়াটির দূরত্ব মেরেকেটে দু' কিলোমিটারের। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন বয়সের মহিলাকে দেখা যায় নিকটস্থ হনুমানজীর মন্দিরে। বজরংবলীর কৃপাতেই কিনা কে জানে মন্দির থেকে বেরোতেই রমণীসুলভ কোমলতা নিমেষে উধাও হয়ে যায় তাঁদের, পুরোদস্তুর কুস্তিগীরের হাবভাবে তাঁরা চাঁদগীরাম আখড়ার কুস্তির মঞ্চে আবির্ভূত হন তাঁরা। গুরু চাঁদগী রাম ১৯৭৫ সালে এই আখড়াটির প্রতিষ্ঠা করেন। আজ চাঁদগীরামের নাম যে ভারতীয় কুস্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমানে আখড়ার প্রশিক্ষকের ভূমিকায় রয়েছে তাঁরই পুত্র-কন্যা, যথাক্রমে জগদীশ কালিরামন ও দীপিকা কালিরামন। বিপক্ষকে 'শুইয়ে' দেবার শিক্ষা নিতে এঁদের কাছে মল্লদ্বন্দ্বের শিক্ষা নিচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের জনাকুড়ি রমণী। সাত বছরের ভাইঝি চিরাক্ষী-কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন দীপিকা। কিভাবে হাঁটু বেঁকিয়ে এবং 'পাঞ্চ' মেরে তার চেয়ে অনেক বেশি বয়সী এবং শক্ত-সমর্থ মহিলাকে 'পরাস্ত' করতে হবে, সেই শিক্ষাই দিচ্ছিলেন তিনি। জানালেন, ''দেহের ওজনের ওপর এটা নির্ভর করে না। নির্ভর করে শক্তি, গতি এবং কর্মতৎপরতার ওপর।''

প্রথম সেশনের শেষে দুগ্ধ পান বাধ্যতামূলক। জগদীশ পত্নী পুনম কালিরামন জানাচ্ছেন, ''আমরা কখনও দুধের অভাব হতে দিই না। ঘরে দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা হয়, কারণ মেয়েদের এটাই পুষ্টির প্রধান মাধ্যম।'' পরবর্তীকালে বিখ্যাত বহু মহিলা কুস্তিগীর এই আখড়ায় প্রশিক্ষিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নেহা রাধী (২০১২ এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ মেডেল জয়ী) এবং সোনিকা কালিরামন (২০০৩-এ জুনিয়র এশিয়ান গেমসে রৌপ্যপদক জয়ী এবং এই বছর বিগ বস-এর অন্যতম অংশীদার)। ১৯৭৫-এ যখন আখড়াটির সূচনা হয় তখন এটিই ছিল দেশের প্রথম মহিলা কুস্তির আখড়া। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময় আখড়াটি যেভাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছে তাতে চাঁদগী রামের ছয় সন্তানের প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে প্রচলিত সামাজিক ধারণা কুস্তি ছেলেদের খেলা। তাই মেয়েদের কুস্তির আখড়া ব্যাপারটা প্রথম দিকে অভিনব তো ছিলই। উপরন্তু ব্যাপারটা ভাল চোখেও নেননি অনেকে। এই সামাজিক বাধাটা অতিক্রম করা সেদিন হয়তো খুব সহজ কাজ ছিল না। সরকারি অনুদানও বিশেষ পাওয়া-টাওয়া যায় না। এই বাজারে সরকারি তরফে হাজার দু'য়েক টাকা মাসিক অনুদান কিংবা এম সি ডি থেকে বার্ষিক যৎসামান্য অনুদান যে প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই অপ্রতুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাত বছরের ভাইঝি চিরাক্ষীকে কুস্তির কৌশল শেখাচ্ছেন দীপিকা।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Sabji Mix
kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Turmeric Powder
SUPER Cumin Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

অসমে পুলিশের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে

সংবাদদাতা ।। অসমে পুলিশের কাজে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং হস্তক্ষেপের গুরুতর অভিযোগ উঠল। সম্প্রতি এই মর্মে গুয়াহাটি হাইকোর্টে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন নওগাঁ জেলার চীফ্ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশী তদন্তে অনধিকৃত ও অনৈতিক দখলদারির বিষয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্টে।

গত ২৯ মে নওগাঁ সার্কিট হাউসে কতিপয় দুষ্কৃতী পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির এক সদস্যের উপর হামলা করে। ওই ঘটনায় ধৃত একজন আক্রমণকারীকে রীতিমতো ভি আই পি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। এই ঘটনাতেই জেলা দায়রা জজ গুয়াহাটি হাইকোর্টকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যে গুয়াহাটি হাইকোর্ট গত ২০ জুন এক আদেশে বলেছেন, পি এ সি সদস্যের উপর হামলা মামলার তদন্তভার সি আই ডি-কে হস্তান্তর করতে। আদালত পুলিশী তদন্তে সন্তুষ্ট নন। বিচারপতি বি ডি আগরওয়ালা ওই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— একজন 'ডি এস পি' পদমর্যাদার সি আই ডি অফিসার তদন্তের বিষয়টা দেখবেন এবং একজন 'আই জি' পদমর্যাদার অফিসার তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে নজরদারি করবেন। হাইকোর্টের নির্দেশে একথা বলা হয়েছে। পি এ সি সদস্যের উপর হামলা মামলায় নুরুল হুদা এবং মানিক আলি'র 'আগাম জামিন' 'আবেদনের শুনানী হাইকোর্ট আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে। হামলাকারী সফিকুল ইসলামকে অবশ্য হাইকোর্ট জামিন দিয়েছে। হাইকোর্ট আরও একটি সুয়োমটো মামলায় (২৫৯১/২০১২) রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডি জি-কে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। ঘটনাটি এরকম—

কার্বিআংলং জেলার পানইংতি গ্রামে গত ২০১০ সালের ৩০ অক্টোবর রামচন্দ্র শা'র দুই মেয়ে রাধিকা ও গায়ত্রীর উপর অত্যাচার হয়। অত্যাচারীরা রাজ্যের মন্ত্রী খরসিং ইংতির অনুগামী বলে পরিচিত। তারা রামচন্দ্র শা'র জমি দখল করতেই ওই অত্যাচার চালিয়েছে।

অত্যাচারিতারা হাইকোর্টে অভিযোগ করেছে অত্যাচারীরা মন্ত্রীর অনুগামী বলে পুলিশ মন্ত্রীর প্রভাবে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

হাইকোর্ট রাজ্যের মুখ্যসচিব ও পুলিশ প্রধানকে রিপোর্ট দিতে বলেছেন এবং ডি জি-কে কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন। মহামান্য গুয়াহাটি হাইকোর্ট উপরোক্ত বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশের ডি জি-কে ২৯ আগস্টের মধ্যে হলফনামা দায়ের করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ছত্তিশগড় সরকারের 'অটল বিহার' গৃহ- নির্মাণ প্রকল্প শুরু

সংবাদদাতা ।। ছত্তিশগড়ে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার রাজ্যে গরীব পরিবারের জন্য এক লক্ষ গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পের শুভারম্ভ করল গত ২৬ জুন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রমণ সিং রাজনন্দনগাঁও জেলার পেন্ড্রীতে এই উপলক্ষ্যে ভূমিপূজন করেন। গ্রামীণ ও আধাশহর এলাকার মানুষেরা এজন্য উপকৃত হবেন। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে— 'অটলবিহার' যোজনা। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ সিং বলেন, রাজ্যের গরীব মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে রাজ্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আবশ্যক রেশন দিতে রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। পেন্ড্রীতে 'অটল বিহার' প্রকল্পে বিভিন্ন আয়ের মানুষের জন্য ৩৬ কোটি টাকা দিয়ে ৪৩৯টি ঘরের এক আবাসীয় কলোনী তৈরি হবে। এই প্রকল্পে রাজ্য জুড়েই রাজ্য আবাসন পর্যদ এক লক্ষ বাড়ি তৈরি করবে।

মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, সার্বজনিক বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যে ৩৪ লক্ষের বেশী গরবী পরিবারকে এবং অন্য ২০ লক্ষ পরিবারকে দীর্ঘদিন যাবৎ রেশন দেওয়া হচ্ছে। এই নীতির ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার গৃহহীনদের জন্য গৃহপ্রদান কর্মসূচী নিয়েছে। এবং এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। এদিকে রাজ্যে বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে। এজন্য অনেকেই নিম্নমানের ট্রান্সফর্মারকে দায়ী করছেন। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ট্রান্সফর্মার সরবরাহকারী সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। তাদের হয়ে যাঁরা সুপারিশ করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ হয়েছে।

সোনারপুরে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

সোনারপুর বীণাপাণি হিন্দু মিলন মন্দিরে গত ১ জুন থেকে দশদিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে অংশগ্রহণ করেন একুশজন। শিক্ষক হিসাবে পাঠদান করেন সংস্কৃত ভারতীর কার্যকর্তা রাহুল হালদার। গত ১০ জুন নৃত্য, গীত ও নাটকের মাধ্যমে শিবিরের সমাপ্তি হয়। মিলন মন্দিরের সম্পাদক সমীর চরিতের সহযোগিতায় সৌরেনবাবু, নিকুঞ্জবাবু ও নিরাপদ হালদার সমারোপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃত ভাষার আবশ্যকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃত ভারতীর পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ।

স্বাস্থ্য সেবা শিবির

গত ২৩ জুন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় একদিনের স্বাস্থ্য সেবা শিবির হয়ে গেল পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ব্লক-১- এর মেরং উচ্চতর বিদ্যালয়ে। কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা— ডাঃ আই বি সি, ডাঃ আর কে শর্মা, ডাঃ শিবতোষ পাণ্ডে এই শিবিরে উপস্থিত থেকে রোগীদের চিকিৎসা করেন। শিবিরে রোগী ছিলেন ৭০৩ জন। এর মধ্যে ২০৭ জন চোখের রোগী ছিলেন। চোখের রোগীদের ‘পাওয়ার’ নির্ণয় করা হয়। ৬৭ জন রোগীকে চশমা দেওয়া হবে এবং ৬০ জন রোগীকে কলকাতায় এনে বিনামূল্যে ‘ক্যাটারাক্ট অপারেশন’ করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সাধারণ রোগীদেরও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

সমাবেশ সমাচার

নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে সম্ভাষণ শিবির

নবদ্বীপে ভারতী চতুষ্পাঠী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে গত ৭ জুন থেকে ১০ দিন ব্যাপী সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। পঁয়ষট্টি জন শিক্ষার্থী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শিবিরে অংশগ্রহণ করে সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা করেন। শিক্ষক ছিলেন বিশ্বজিৎ প্রামাণিক।

গত ১৬ জুন সমাপ্তি কার্যক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ইটাচূণা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য এবং সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ব্যাকরণ বিভাগের প্রধান রাধারমণ শাস্ত্রী। সংস্কৃত ভারতীর সম্ভাষণ শিবিরের মাধ্যমে নবদ্বীপে সংস্কৃতময় পরিবেশ নির্মাণের আহ্বান জানান অতিথিরা। প্রধান বক্তা ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

গৌরগোপাল ঘোষ ও শম্ভু দাসের স্মরণসভা

ভারতীয় মজদুর সংঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রাক্তন সভাপতি, 'রাজ্য কর্মচারী সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং গভঃ এমপ্লয়িজ ন্যাশনাল কনফেডারেশনের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি গৌরগোপাল ঘোষ গত ২ জুন প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

শম্ভু দাস পরলোকগত হয়েছেন বিগত মার্চ মাসে। তিনিও ছিলেন রাজ্য কর্মচারী সংঘের এক অতন্দ্র সেবক। তাঁদের মৃত্যুতে বি এম এস সহ রাজ্য- কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সব রাজ্য ইউনিট তাদের নিজ নিজ রাজ্যে স্মরণসভা করছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বি এম এস গত ১৬ জুন প্রদেশ কার্যালয় মানিকতলার নরেশ ভবনে এক স্মরণসভার আয়োজন করে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের পূর্ব ক্ষেত্রীয় সংঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা মহানগরের সংঘচালক বিশ্বনাথ মুখার্জী, বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বৈজনাথ রায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় বি এম এস নেতা ব্রজেন দাস সহ প্রদেশের বর্তমান ও প্রাক্তন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকেরা।

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈজনাথ রায় উভয়েই বলেন, গৌরগোপাল ঘোষ ও শম্ভু দসের মতো নিষ্ঠাবান কর্মী হারানো সংঘের কাছে এক বিরাট আঘাত। গৌরগোপাল ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রী ঘোষের জীবনের সুখ-দুঃখের অনেক অজানা কাহিনী তুলে ধরেন যা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কোনওদিনই বি এম এস-কে জানিয়ে তাঁর সমব্যথী হওয়ার সুযোগ দেননি।

সভার সভাপতি প্রিয়ব্রত দত্ত এই উভয় নেতার আত্মার শান্তি কামনা করে সভার সমাপ্তি করেন।

শোকসংবাদ

পরলোকে গোপেশ্বর মাহাতো

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার প্রাক্তন কার্যবাহ, হেত্যাপাথর শাখার আর এস এসের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবক সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান গোপেশ্বর মাহাতো বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর গত ১৪ জুন পরলোক গমন করেন। তাঁর বড় ছেলে উত্তম মাহাতো সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের পুরানো প্রচারক, বর্তমানে নবদ্বীপ বিভাগ প্রচারক। দাদা, ভাই, স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই কন্যা, ও কয়েকজন ভাইপো, ভাইঝিসহ একান্নবর্তী সঙ্ঘময় পরিবার।

তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ একজন আদর্শনিষ্ঠ কার্যকর্তাকে হারালো।

যোগে রোগ মুক্তি

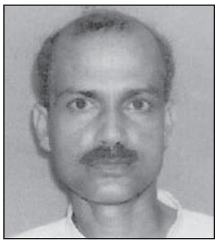

আশীষ পাল

প্রাণায়াম কি?

প্রাণায়াম : অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম। প্রাণের আয়ম অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সংযম সাধনই হলো প্রাণায়াম। মানুষ প্রতি মিনিটে গড়ে ১৮ থেকে ২০ বার শ্বাসগ্রহণ করে থাকেন। খরগোশের মধ্যে এই গতি ৫০-৬০ বার পর্যন্ত হয় এবং তুলনামূলক ভাবে তার আয়ু অনেক কম। ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীদের আয়ু প্রায় ২০ থেকে ২৫ বছর হয় এবং তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হয় গড়ে ৩০-৪০ বার। কচ্ছপ এক মিনিটে কেবল ৩ থেকে ৪ বার শ্বাসগ্রহণ করে এবং তার আয়ু অপেক্ষাকৃত বেশিদিন, প্রায় ৩০০ বছরের কাছাকাছি হয়। এই কারণে মানুষের আয়ুকেও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হ্রাস করে বর্ধিত করা সম্ভব। সুতরাং প্রাচীনকালে যোগ অভ্যাসী পুরুষ ৪০০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হতেন। প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ— রেচক, পূরক, কুম্ভক।

রেচক : রেচন করা বা দেহের মধ্যের বায়ুকে বাইরে নির্গত করা।

পূরক : পূরণ করা অর্থাৎ বাইরের বায়ুকে দেহের ভিতর প্রবেশ করানো।

কুম্ভক : শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ অবস্থায় শরীরের অভ্যন্তরীণ গতিবিধির উপর প্রভাব বিস্তার করা। কুম্ভক আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত : যথা—

(ক) **আন্তরিক কুম্ভক :** শ্বাস গ্রহণ করে তাকে রুদ্ধ করে রাখাকে বলে 'আন্তরিক কুম্ভক'।

(খ) **বাহ্য কুম্ভক :** শ্বাস বাইরে ত্যাগ করে রুদ্ধ করে রাখার ক্রিয়াকে বলে 'বাহ্য কুম্ভক'।

(গ) **সহিত কুম্ভক :** রেচক ও পূরক যুক্ত হলে তাকে বলে 'সহিত কুম্ভক'।

(ঘ) **কেবল কুম্ভক :** রেচক ও পূরক রহিত হলে তাকে বলে কেবল কুম্ভক।

প্রাণায়ামের উপকারিতা :

■ **সুস্থ শরীর :** দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরে যায়, দেহ রোগহীন ও সুস্থ থাকে।

■ **দীর্ঘায়ু :** শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহ দূরীভূত হওয়ায় মনের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় ফলে আয়ু হয় দীর্ঘস্থায়ী।

■ **কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি :** দেহের পাচনতন্ত্রকে সবল ও সুদৃঢ় করে তার ফলে দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া শরীরের ক্লান্তি দূর করে জ্ঞানতন্ত্র শক্তিশালী হয়, তার ফলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, মনের প্রফুল্লতা ভাব জাগে, শুধু তাই নয় পরিপূর্ণ ব্রহ্মচারী হতে হলে যে সকল গুণ থাকা দরকার তা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

প্রাণায়ামের বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য :

প্রাণায়ামের উপকারিতা বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ওই সব উপকার সহজে লাভ করা যায় না, সেইজন্য কিছু নিয়ম পালন করে চলতে হয়, নিয়ম না মেনে চললে প্রাণায়াম করলেও তার উপকারিতা যথাযথ ভাবে পাওয়া যায় না। এখানে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হলো, যা পালন করলে লাভ পেতে পারেন।

স্থান : প্রাণায়াম যেখানে-সেখানে বসে করা উচিত নয়। প্রাণায়াম শুদ্ধ, নির্মল স্থানে করা উচিত। যেমন সমুদ্রতীর, নদীতীর, সরোবরের তীর, পাহাড়ের নির্জন অংশ বা কোনও মাঠের নির্জন অংশ এর জন্য উপযুক্ত। সব থেকে বেশী প্রয়োজন নির্মল বাতাস ও শান্ত পরিবেশ।

সময় : যে কোনও সময়ে প্রাণায়াম করা উচিত নয়। শরীর ক্লান্তিহীন ও মন পবিত্র থাকে এমন সময়েই প্রাণায়াম করা উচিত। প্রাতঃকালই এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সময়। তবে সন্ধ্যাকালেও করা যেতে পারে। ভোজনের ৪-৫ ঘণ্টা পর করা উচিত। ভরা পেটে বা খালি পেটে নয়। প্রাণায়ামের ১৫ মিনিট পরে তরল খাবার খেতে পারেন, ৩০ মিনিট পরেই সাধারণ খাদ্যগ্রহণ এবং স্নান করা যেতে পারে।

বসার পদ্ধতি : সিদ্ধাসন, বজ্রাসন বা পদ্মাসনে বসে করা উচিত। বিশেষ করে কম্বল বা কুশাসনে ভাল হয়। এছাড়া তাড়াহুড়ো করে প্রাণায়াম করা উচিত নয়। তার জন্য মনকে এক কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন। মুখ, চোখ, কান, মুখমণ্ডলে যেন কোনও প্রকারে উদ্বিগ্নতা না থাকে, স্বাভাবিক রাখতে হবে, তার জন্য ওম্ (অ+উ+ম) লম্বা নাদ পূর্ণ উচ্চারণ করা। আর ভজন, কীর্তন করা উচিত এবং চিন্তাবিহীন মন হতে হবে। এইসব করলে মন শান্ত হবে। এছাড়া সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করা দরকার— যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, প্রণব মন্ত্র এবং শ্বসন শুদ্ধি ইত্যাদি করলে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হবে। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী বিকশিত হবে।

রঙ্গম

‘সায়ক’ আয়োজিত নাট্যবক্তৃতামালা

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

গত ২০-২১ জুন সায়ক নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যবক্তৃতামালার সূচনায় সায়কের পরিচালক মেঘনাদ ভট্টাচার্য বলেন, নাট্যকর্মীদের প্রয়োজনেই এই নাট্য বক্তৃতামালা। যাঁরা হাতে-কলমে কাজ করেন তারা যদি অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন নাট্যকর্মীরাই উপকৃত হবেন। আগের অনেক নাট্য বক্তৃতাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

প্রথমদিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘নির্দেশক ও অভিনেতার সম্পর্ক’। বক্তা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন। তাঁর বক্তব্য, অভিনয় মানে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অন্য একজন হয়ে ওঠা ও অভিনয়ের মাধ্যমে সময়কে তুলে ধরা। কল্পনার ওপর ও অভিনেতাকে নির্ভর করতে হয়। কিছু কিছু নাট্য মুহূর্ত নির্দেশকের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়, একজন অভিনেতাই তৈরি করতে পারে এরকম নাট্যমুহূর্ত। আবার কিছু মুহূর্ত তৈরি হয় অভিনেতা ও নির্দেশকের যৌথ প্রয়াসে। শম্ভু মিত্র বলেছেন, নির্দেশকের কাজ মাস্টারি করা নয়, কিন্তু এখন প্রায়ই নির্দেশককে অভিনয় করে দেখাতে হয়। যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করে দেখান কিন্তু বিভাস চক্রবর্তী দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। নির্দেশকের সবচেয়ে জরুরী অভিনেতা মানুষটাকে চিনতে পারা। তার মধ্যে শৈল্পিক সততা থাকলে, তার অভিনয়ের খামতিকে পুষিয়ে নিতে পারেন নির্দেশক।

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল, ‘নাটককার এবং নির্দেশকের সম্পর্ক’। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন নাটককার বনাম নির্দেশকের মাধ্যমে নাটক-শিল্পের যাত্রা। নাটককার যেভাবে ঘটনাকে অনুভব করছেন পরিচালক তা ভিন্নভাবে অনুভব করেন। কোনও একটি চরিত্রের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি। কোনও চরিত্রের আবেগ, মনন, অনুভূতির ক্ষেত্রে নাট্যকার এবং নির্দেশকের নিজস্ব অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য থাকে। তাই হয়তো নাট্যকার বেশির ভাগ সময়ই তার নাটকের মঞ্চরূপ দেখে খুশি হতে পারেন না।

ব্রাত্যবাবু জানান প্রাচীন গ্রীসে নাট্যকারকে শিক্ষক বলা হয়েছে। তখনও পরিচালক সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়নি। পরবর্তীকালে ইউরোপে অভিনেতা ও পরিচালকের মধ্যে পার্থক্য করা শুরু হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের নাট্যকারদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, কোনও পরিচালকের নাম পাওয়া যায় না। ভারতের ঐতিহ্যেও নাট্যকারই প্রধান।

একজন মানুষের ভালো-মন্দ, তার সময়, সবকিছুকে তুলে ধরেন নাট্যকার এবং একইভাবে পরিচালকও। নাট্যকারের কাছে কথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ওই কথার মাধ্যমে অভিনেতা কি বোঝাতে চাইছেন তা পরিচালকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শেষ বিচারে নাটক মানুষের বেঁচে থাকা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেয়।

বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষে নাটক ‘কথা না রাখার কথা’

মিতদ্রু দত্ত

বাংলা নাট্যজগতে এমন নাটক সত্যিই হাতে গোনা। সমাজ সচেতনতার ব্যতিক্রমী নজির রাখল কলকাতা নাট্য সংঘের সাম্প্রতিক প্রযোজনা ‘কথা না রাখার কথা।’ নির্দেশনা বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের। একসময় শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্তরা এই নাট্য সংঘের দায়িত্বে থাকতেন। ১৯৭০ সাল থেকে অর্থাভাবে বন্ধ হয় দল। ১৯৮২-তে খোলে। তারপর কিছুদিন অনিয়মিত থাকার পর ১৯৯৮ সাল থেকে পেশাগতভাবে মঞ্চে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাদের শো-এর আমন্ত্রণ থাকে নিয়মিত। এক ঝাঁক নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী এই নাট্য দল। যা অনেককে ভাবাবে।

‘কথা না রাখার কথা’ জরুরী অবস্থার পটভূমিতে লেখা মুরারি মুখার্জীর নাটক। প্রেক্ষাপটটি এই রকম— সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে প্রায় রাইটার্স থেকে। সেন্সরের নামে ফতোয়া। চারদিকে ভয়ের পরিবেশ। আতঙ্কিত সবাই। ধরে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে। এমনই এক সময় রাজীব রায় (আশিস মুখোপাধ্যায়) পেশায় সাংবাদিক। একটি ইংরেজি দৈনিকে চাকরি করেন। শাসক তাকে টার্গেট করে। সত্যি লেখার অপরাধে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে সরকার সেই দৈনিককে।

অন্যদিকে বাড়িতে মা (অনামিকা সাহা), বাবা (বোধিসত্ত্ব মজুমদারক), বোন (কোয়েল সিন্‌হা), দাদা (বিশ্বজিৎ দে) বেকার। চাকরি না থাকলে না খেতে পেয়ে মারা যাবে সবাই। ভাল কাজের লোক হিসাবে অফিস তাকে বলে তোমার মাইনে বাড়ানো হবে, যদি হাউসের কথা মতো খবর লেখ তবেই। সে রাজি হয় না। তার বিবেক তাকে দংশাতে থাকে। সে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেয় এবং গণআন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠে। শাসক ক্ষুব্ধ হয়। আক্রমণের মাত্রা বাড়তে থাকে। তবু সে দমে না। অবশেষে নানা নাটকীয় মোড় পেরিয়ে শেষ দৃশ্যে দেখা যায় শাসকের মৃত্যু ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং করে। মানুষ আনন্দ প্লাবনে ভাসছেন। নির্দেশনা সার্থক। অভিনয়ও প্রশংসনীয়। জরুরী অবস্থার পদধ্বনিকে শব্দের, আলোর, মঞ্চসজ্জার ম্যাজিকে চমৎকার দেখানো হয়েছে।

শব্দরূপ-৬৩২ সাবিত্রী দাশ

	১	২			৩		
					৪		৫
৬		৭		৮			
৯							
			১০		১১		
		১২					
১৩							
				১৪			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. এই মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংস হয়েছিল, ৪. ইন্দ্র, ৭. আদরের ডাকে কালাচাঁদ, শ্রীকৃষ্ণ, ৯. মহাদেব, শিব, ১১. সার্থক, ব্যর্থ হয় না এমন, ১২. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম এঁকে নিহত করেছিলেন, প্রথম দু'য়ে নবমগ্রহ, তিনে জননী, ১৩. জেলে জাতি, ১৪. হিন্দুদের তীর্থস্থান, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থল।

উপর-নীচ : ২. শিব, শেষ দু'য়ে চুল, ৩. চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতির স্ত্রী, প্রথম দু'য়ে কাব্যে গ্রহণ করা, ৫. পতিগৃহ, ৬. ইন্দ্রপুরী, স্বর্গ, তিনে-চারে মাতগুড়, ৮. চন্দ্র, সপ্তাহের একটি বার, ১০. সূর্যপূজার ঘট, ১১. শকুন্তলার সখীবিশেষ, কর্দমমুনির কন্যা এবং অত্রিমুনির পত্নী, ১২. ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থিত অঞ্চলবিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২৯
সঠিক উত্তরদাতা
সৃজন কুমার হাজরা
রামপুর, বাঁকুড়া
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

	হ	নু	মা	ন			বি
শি	ব			মু			রা
	নী			চি	ত্র	কূ	ট
হা	য়	ন			স		
		রে			ন	ম	স্য
প	ঞ্চা	ন	ন			হা	
য়ো			ন্দি			কা	লী
ধি			নী	লা	চ	ল	

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৩২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ জুলাই, ২০১২ সংখ্যায়

বইয়ের এজেন্ট চাই

নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ ও ডিগ্রি কোর্ষের বই বিক্রয়ের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্লক ভিত্তিক এজেন্সি দিতে চাই।

সম্পূর্ণ পোষ্টাল ঠিকানা দিয়ে এস.এম.এস করুন ৯৮৩২০৪৩৫১৫ নম্বরে।

বই - এস.রায় সম্পাদিত "লেটার মার্ক A+"

Ori Plast

ASTMD 1785 DIN 4925

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — ব্যবস্থাপক

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ৩

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

সুবর্ণরেখা প্রকল্পের উদ্বোধন হতে চলেছে চাণ্ডিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি প্রসবযন্ত্রণার শেষে এই জুলাই মাসে বহু প্রতীক্ষিত সুবর্ণরেখা প্রকল্প এবার উদ্ঘাটিত হতে চলেছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পশ্চিম সিংভূম জেলার মানুষ প্রকল্পের সুফল পাওয়ার আশায় আশায় প্রহর গুণছেন। শুরু থেকে এলাকার জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হয়েছে।

মূল বাঁধটা রয়েছে চাণ্ডিল-এ। এছাড়া আরও কয়েকটি রিজার্ভার, ব্যারেজ এবং ক্যানাল। ক্যানেল দিয়ে ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে সেচের জন্য জল যাবে। চাণ্ডিলে স্থানীয়ভাবে জলবিদ্যুৎ তৈরি করে স্থানীয়ভাবে সরবরাহ করার কথা।

৭২ বছর বয়স্ক গুণধর মুণ্ডা '৭২ সালে প্রথম দিকে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর বক্তব্য, বিক্ষোভে বিশেষ লাভ হয় না। তিনি চান তাঁর ছেলের একটা চাকরি হোক।

১৯৭২ থেকে বাঁধের কারণে বাস্তুচ্যুতরা হাজার বার ধর্না, মিছিল, ম্যারাপ বেঁধে অনশন করেছেন। দশ হাজার জনজাতি মানুষ হাতে তীরধনুক নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এ ঘটনা ৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালের। সেদিন গুলিতে চারজন মারা গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ হয়েছে, প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে। জলাধার-এ জল ভর্তি হয়েছে। বাধার পর বাধা এসেছে। কাজ বন্ধ হয়েছে বার বার। বাঁধের গ্রাসে পড়েছে ১৮০০ হেক্টর বনভূমি। ১৯৮০ সালে পাশ হয়েছে বনভূমি সংরক্ষণ আইন। আবার কাজ বন্ধ। ছাড়পত্র চাই পরিবেশ ও বনমন্ত্রক থেকে। প্রতিবাদীরা নতুন করে উৎসাহ পায়। প্রকল্পটি নবজীবন লাভ করে যখন বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১২৭ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়। কিন্তু ক্ষোভ-বিক্ষোভের কারণে বিশ্বব্যাঙ্ক হাত গুটিয়ে নেয় ১৯৯০ সালে। অবিভক্ত বিহার সরকার কাজ বন্ধ করে দেয়। ১৯৯৮ পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকে।

এরকম একটা সময়ে নাবার্ড (NABARD) ১১৮ কোটি টাকা ধার দেয়। আবারও নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়। ১৩ বছর কাজ বন্ধ। এবার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। ১৯৯৯ সালে সি এ জি রিপোর্টে মন্তব্য— ''সুবর্ণরেখা প্রকল্পের অফিসাররা পুনর্বাসন খাতের ৩১.০৪ কোটি টাকা নয়ছয় করেছে।'' চাণ্ডিল সেক্টরে 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' প্রকল্পে ৩৯৫টি বাড়ি তৈরি করার কথা। যার খরচ ধরা হয়েছিল ৬৫.৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে যাদের পাওয়ার কথা তারা পায়নি। ৩৯৩টি বাড়ি ৬৫.৩৯ লক্ষ টাকায় তৈরি হলেও নিম্নমানের উপাদান ব্যবহারের কারণে তা ভেঙ্গে পড়ে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ৭৪.৩১ লক্ষ টাকা দিয়ে স্কুল বাড়ি তৈরি করালেও তা এখনও ব্যবহারই করা হয়নি।

ঝাড়খণ্ড সরকার সুবর্ণরেখা প্রকল্পের জন্য নতুন করে আবেদন করে। গত বছর বন ও পরিবেশমন্ত্রক ছাড়পত্র দেয়। কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে সেচ প্রকল্পের অগ্রগতি হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয় বাড়তে বাড়তে গিয়ে ঠেকে ৬,৬১৩ কোটি টাকায়। এই টাকা অবিভক্ত বিহার ও ঝাড়খণ্ড মিলে খরচ করে ফেলেছে। ৬০ শতাংশ কাজ শেষ। এখন সরকার সবকিছু পরিচালনার জন্য একটি স্বশাসিত পর্ষদ গঠন করতে চাইছে।

এখন তহবিলে স্ফীত কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদাররা এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন। দেখছেন পুনর্বাসন নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ আছে কিনা! ঝাড়খণ্ড সরকারের জলসম্পদ দপ্তরের মুখ্যসচিব এস কে শতপথী পুরো বিষয়টা দেখভাল করছেন। তিনি বলেছেন— ''এসময়ে মানুষের মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাস্তুচ্যুতদের প্রতিটি দাবী বিচারবিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে। পুনর্বাসন এলাকা এক আদর্শ গ্রামে পরিণত হবে।''

১৯৭২ থেকে ২০১২ সুবর্ণরেখা প্রকল্পের নানা টানাপোড়েন ও ওঠাপড়া:

১৯৭৮-এ অবিভক্ত বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় সুবর্ণরেখার জল ব্যবহারের জন্য।

১৯৭৯— প্রকল্পের কাজ শুরু।

১৯৮০— বন ও পরিবেশ আইন বলবৎ। বনভূমি অধিগ্রহণ আটকে যায়।

১৯৮২— বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১২৭ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে।

১৯৯০— বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্য বন্ধ। বাঁধের কাজও বন্ধ।

১৯৯৮— নাবার্ড ১১৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।

১৯৯৯— আবার বিক্ষোভের কারণে কাজ বন্ধ।

২০১১--- ঝাড়খণ্ড সরকার বন ও পরিবেশ দপ্তরকে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানায়। বন ও পরিবেশ মন্ত্রক ছাড়পত্র দেয়। প্রকল্প ব্যয় ৬,৬১৩.৭৪ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছায়।

সুবর্ণরেখা প্রকল্পের মোট এলাকা ৩১,৮১০ হেক্টর।

১৮০০ হেক্টর বনভূমি।

১৬৫,৭৬ পরিবারের বসতি

প্রকল্প ব্যয় ধাপে ধাপে বেড়েছে

১৯৭৮—১২৮.৯৯ কোটি টাকা

১৯৮২—৩৫৭.৭০ কোটি টাকা

১৯৯০—১,৪২৮.৮২ কোটি টাকা

১৯৯৮—১,৫০২.২৭ কোটি টাকা

২০০২—২,৮৬৯.৭৬ কোটি টাকা

২০১১—৬,৬১৩.৭৪ কোটি টাকা

লক্ষ্য— ঝাড়খণ্ডে ২,৩৬,৮৪৬ হেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ ৯০,০০০ হেক্টর এবং ওড়িশার ৫০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা। এছাড়া ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার আদিত্যপুর, চাণ্ডিল, গালুডি এবং খড়কাইতে পানীয় জল সরবরাহ করা।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
9 July - 2012

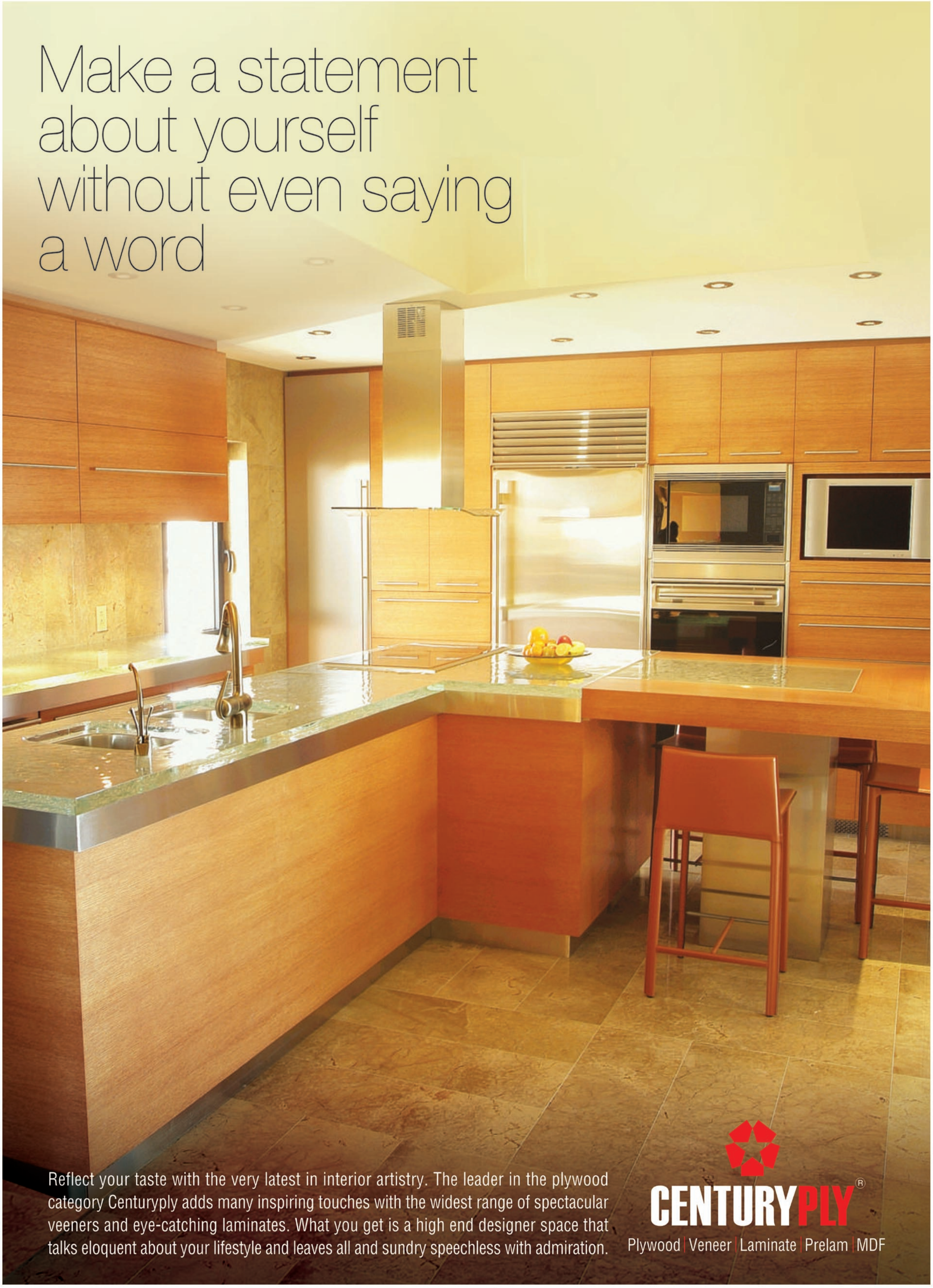

দাম : ৭.০০ টাকা